প্রাণাধিক প্রিয় সুধীমনকে

উপন্যাস প্রসঙ্গে

এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক নয়। আবার পুরোটাও বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বাস্তব আর কল্পনা—সত্য আর ভাবনার আলো-আঁধারিতে মিলেমিশেই এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে।

এর্নাকুলামে এক সময় আমি একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম। মাস আটকের মত থেকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই 'আয়নার মধ্যে আয়না' উপন্যাসটি লিখেছি।

সমীরণ গুহ

'মায়ের আঁচল'
২৪/১ বি, নাকতলা লেন
কলকাতা-৭০০০৪৭

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

রূপ নয় আগে মন

হৃদয়ে শিলাবৃষ্টি

পৃথিবীর উজ্জ্বল তুমি

টুকুনের নাকছাবি

দময়ন্তী উথাইয়া

উত্তরের বাতাস

নিঃশব্দের নিকটে

অশ্বক্ষুরের শব্দ

সাঙ্গ হলো খেলা

নিজের ছবি

শ্রাবণের মাঝামাঝি

আয়নার মধ্যে আয়না

আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাদ্রাজ সেন্ট্রালে ট্রেনটা ঢুকবে। বিছানাপত্র বাঁধা বা টুকিটাকি জিনিস গুছানোর পালা শুরু হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে অনেকে আবার নিজেদেরকেও সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র অমিতাভই উপরের বাঙ্কে এখনও শুয়ে রয়েছে। ওর মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। কেমন যেন নির্বিকার এবং অত্যন্ত উদাসীন হয়ে সে সিগারেট খেয়ে চলেছে। অমিতাভর বয়স পঁচিশ। মেদহীন পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হাইটের চেহারার মধ্যে বিরাট কিছু সৌন্দর্য না থাকলেও শান্ত একটা ব্যক্তিত্ব তাকে সব সময়েই ঘিরে রয়েছে। গত বছর এম. কম. পাশ করার পর থেকে একটা বছর সে শুধু চাকরি খুঁজেছে। যথারীতি পায়নি। এখন অবশ্য সে একটা চাকরি নিয়েই এর্নাকুলাম যাচ্ছে।

নিচের সিট থেকে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বেশ আন্তরিকতার সুরে অমিতাভর উদ্দেশ্যে বললেন, কী হলো. আপনি নামবেন না? সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিন।

অমিতাভ সামান্য হেসে বললো, আমার অল্প জিনিস। স্যুট-কেস আর হোল্ডঅল। স্টেশনে ট্রেন ঢোকার পরেও ওটা গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের নাম সুন্দরম। উনি ভুবনেশ্বর থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। তখনই অমিতাভর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি ছোকরা কফি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই সুন্দরম নিজে একটা কাপ হাত বাড়িয়ে নিলেন। আর একটা কাপ অমিতাভর দিকে তুলে ধরে বললেন, ধরুন।

ট্রেনে এক একজন মানুষ আছেন যিনি উঠেই সকলের সঙ্গে আলাপ বা বন্ধুত্ব করবেন—যেন কতোদিনের চেনা! শুধু তাই

নয়, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ অগ্রণী ভূমিকা নেন। সুন্দরম গতকাল থেকে অমিতাভকে একটা পয়সাও খরচ করতে দেননি। প্রত্যেকবারেই হৈচৈ করে নিজে মিটিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণে অমিতাভ যথেষ্ট লজ্জিত ছিল। এখন কফির কাপটা না নিয়ে প্রথমে সে মানিব্যাগটা খুলতেই ধমক খেল। সুন্দরম বললেন, আপনাকে টাকা বের করতে বলা হয়নি। কফির কাপটা অনুগ্রহ করে ধরুন। গরম কাপ আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না।

আমাকে একবার অন্তত দিতে দিন।

সে হবে'খন।

আর সুযোগ কোথায় ?

আপনি একটুও আশাবাদী নন, সুন্দরম খুব শান্ত হেসে বললেন, এটাই আমাদের শেষ দেখা, এটা ধরে নিচ্ছেন কেন? সেদিন না হয় আপনিই এইভাবে গরম কাপ ধরে রাখবেন। পয়সা দেবার জন্য আমি তখন সমানে তর্ক করে যাবো। আমতাভ আরও বেশি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরমের হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে বললো, সে সময়ও বোধহয় আপনি আমাকে সুযোগ দেবেন না।

কথাটা শুনে সুন্দরম হাসতে লাগলেন। অমিতাভ যে খুব একটা ভুল বলেনি, এই হাসি দিয়ে তিনি যেন সেটাই সমর্থন করলেন। কফির কাপে ছোট ছোট দুটো চুমুক বসিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, মাদ্রাজে নেমে আপনি কোথায় যাবেন বলেছিলেন যেন ?

এর্নাকুলাম।

এইবারে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সুন্দরম যেখানে বসে আছেন সেই আসনের জানলা ঘেঁষে একটি মেয়ে বসে আছে। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। কোমর ছাড়ানো একমাথা ঠাসা ঢেউ খেলানো কালো চুলের প্রদর্শনী যেন। ঐ চুলগুলোই তাকে বোধহয় শ্রীময়ী করে তুলেছে। গায়ের রং শ্যামলা কিন্তু তার সুঠাম দেহ এবং লাবণ্যময় মুখের গড়নের জন্য ঐ রংটং দিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, মেয়েটি

হাওড়া থেকেই উঠেছিল। এবং আশ্চর্যজনকভাবে সে নির্লিপ্ত ছিল। সারাক্ষণ একটা মোটা ইংরেজী বই পড়ে কাটিয়ে দিল। না, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মেয়েটি একটি বারের জন্যেও অমিতাভর দিকে তাকায়নি। এই বয়সে এতোটা উদাসীন হতে পারা কীসের লক্ষণ অমিতাভ সেটা বলতে পারবে না। তাকে দেখতে যদি খুব বিচ্ছিরি হতো তাহলেও না হয় একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। মেয়েটা তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা যা হোক একটা কিছু করছে। কিন্তু সেই যে একটা বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, কাছাকাছি বসে থাকা একটা ছেলের দিকে বিন্দুমাত্র তাকানোরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি—সে মেয়ে কী দিয়ে গড়া সেটা ঈশ্বরই বলতে পারবেন। অমিতাভ বেশ কয়েকবারই ওকে দেখেছে। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই ভেবেছে এই বুঝি বই থেকে মুখ তুলে তাকাবে। কিন্তু একবারও চোখাচোখি হলো না। তারপর থেকে অমিতাভ নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সুন্দরী মেয়ে বলেই ওর দিকে তাকাতে হবে? তা কেন? সেই মেয়েটিই 'এর্নাকুলাম' কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মুখের দিকে কাজল কালো গভীর দুই চোখ নিয়ে তাকাতেই অমিতাভ দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

সুন্দরমের কফি খাওয়া শেষ হতেই বুকপকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে একটা কাগজের টুকরোয় কী যেন লিখলেন। তারপর সেটা অমিতাভর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সস্নেহে বললেন, চাকরি করতে এই প্রথম কলকাতার বাইরে বেরিয়েছেন। তাও এতো দূরে! কখন কী অসুবিধায় পড়েন বলা যায় না। অবশ্য বিপদে না পড়াই ভালো। এই ঠিকানাটা রেখে দিন। যদি প্রয়োজন হয় কোচিনে গিয়ে মিঃ জেমস গনসালভেসের সঙ্গে দেখা করবেন।

কাগজের টুকরোটা নিতে না নিতেই সুন্দরম আবার সিগারেটের প্যাকেট খুলে অমিতাভর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ধরুন। অমিতাভ এবারে একটু দ্বিধায় পড়লো। আসলে ভদ্রলোকের সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। ট্রেনের দেখা এবং ট্রেনের আলাপে বয়সের কোনো সীমারেখা নেই। সকলেই সকলের

সামনে সিগারেট খায়। অমিতাভ গতকাল থেকে নিজেও তাই করেছে। আজ সকালে মানে একটু আগেও ও'র সামনে সিগারেট খেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিতাভর ধারণা অন্য-রকম। সুন্দরমের বয়স সাতান্ন-আটান্ন হবে। অর্থাৎ প্রায় তার বাবার বয়সী মানুষটা। আলাপটা আন্তরিকতার পর্যায়ে না পেঁছালে অবশ্য এতো কথা অমিতাভ ভাবতো না। মিঃ সুন্দরম গভীর মমতা নিয়ে যেভাবে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করছেন, তার সম্পর্কে ভাবছেন এর পরেও অমিতাভ আর যাই হোক, ও'র সামনে সিগারেট খেতে পারবে না। সে ছোট্ট সুরে বললো, না, থাক।

থাকবে কেন? কী হলো কী আপনার? সুন্দরম ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। গতকাল থেকে যে ছেলেটা তার সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে, হঠাৎ সে যদি আর খেতে না চায় তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়? সুন্দরম হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোনো অন্যায় হয়েছে কী?

অন্যায়টা তো আমারই হয়েছে।

আপনার হয়েছে! কী রকম?

আপনার সামনে সিগারেট খাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। কোনোরকম ভণিতা, আবার বেশি রকম সম্মান দেখাবার প্রতি-যোগিতাও নয় অমিতাভ সহজ কথাটাই সোজাসুজি বললো, আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক, অনেক ছোট!

অমিতাভর স্বীকারোক্তিতে সুন্দরম যে খুশি হলেন না তা নয়। আরও আবেগ নিয়ে তিনি এবারে জোরে হেসে উঠলেন, তবে তো পুরো অন্যায়টা আমারই। অল্পবয়সী একটা ছেলেকে সিগারেট খেতে শেখাচ্ছি। কথাটা শেষ করেই তিনি কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। একটু সময় নিয়ে পরে আস্তে আস্তে বললেন, বছর কুড়ি আগে আমার ছেলেটা মারা যায়। ওর তখন চার-পাঁচ বছর বয়স। বেঁচে থাকলে এখন আপনার······ সুন্দরম কথাটা পুরো শেষ না করেই থেমে পড়লেন। অমিতাভ

শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার আর কোনো ছেলে-মেয়ে নেই ?

না। ঐ একটিই ছেলে ছিল। করুণ হেসে সুন্দরম বললেন, আপনাকে দেখে কেন যে আমার বিজয়ের কথা মনে হলো বুঝতে পারছি না। ওকে তো ভুলেই রয়েছি। তবু যে কেন ভেসে ওঠে ···

মাদ্রাজ সেণ্ট্রালের চার নম্বর প্ল্যাটফরমে ট্রেনটা ঢুকতেই কুলীদের সম্মিলিত চিৎকার এবং ব্যস্ততায় স্টেশন চত্বর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। যাত্রীরা ততোক্ষণে একে একে ট্রেন থেকে নামতে শুরু করে দিয়েছে। যে যার জিনিসপত্রের হিসেব রাখছে। কুলীরা মাল নামাচ্ছে এবং কেউ কেউ ইতিমধ্যে মাথায় পর্বতের বোঝা চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে যাবার জন্য রওনাও দিয়েছে। কোমর ছড়ানো কালো চুলের সেই সুঠাম মেয়েটি অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিমায় কুলীর মাথায় দুটো স্যুটকেস চাপিয়ে একরাশ আভিজাত্য ছড়িয়ে চলে গেল। হোল্ডঅল আর স্যুটকেস নিয়ে অমিতাভ তখন প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে। সে সুন্দরমের জন্য অপেক্ষা করছে। উনি তখনও ট্রেন থেকে নামতে পারেননি। কয়েকজনের পেছনে পড়ে গিয়েছেন। অবশ্য তাড়াহুড়োর কোনো ব্যাপার নেই। ধীরেসুস্থে নামলেই হলো।

প্রায় সবার শেষেই নামলেন সুন্দরম। অমিতাভর সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বাড়ির কাছে এলে কেউ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। দেখলেন না আগে নামবার জন্য সকলে কেমন গুঁতোগুঁতি করছিল। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আমি কি অমন যুদ্ধ করতে পারি? কথাটা শুনলো অমিতাভ। তারপর সামান্য হেসে বললো, আপনাকে একটা কথা বলবো ?

নিশ্চয়ই বলবেন।

যদিও আবার দেখা হবে—আশাটা তেমনই রাখা উচিত, কী বলেন ?

নিশ্চয়ই। সুন্দরম শিশুর মতো হাসলেন।

এই বিদায় মুহূর্তে আপনি আর আমাকে 'আপনি' করে নাই বা বললেন। 'তুমি' করে বললে আমি খুব খুশি হবো।

সত্যি বলছো? সুন্দরম অমিতাভর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অতীতকে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, আচ্ছা অমিতাভ, তোমার কোচিন এক্সপ্রেস তো ছাড়বে সেই সন্ধ্যা সাতটা দশে। সারাটা দিন তুমি কী করবে?

ঘুরে ঘুরে শহর দেখবো।

সে দেখার সময় পাবে। তার আগে আমার বাড়িতে স্নান-খাওয়াটা তো সেরে নিতে পারো। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে খাওয়ার একটা সুযোগ পাই। কী উত্তর দেবে অমিতাভ? যেন তার স্নান খাওয়াটা বড়ো কথা নয়—সুন্দরমই একসঙ্গে খাবার সুযোগ চাইছেন। মানুষকে অহেতুক দয়া না দেখিয়ে কী চমৎকার সৌজন্য প্রকাশ করলেন সুন্দরম। কাউকে ছোট করলেন না। নিজেকেও বড়ো করে তুলে ধরলেন না। মানুষটা সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ট্রেনের ক্ষণিকের আলাপেও যে এমন-ভাবে কাছে টেনে নেওয়া যায় সুন্দরমকে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। বয়স্ক মানুষ হয়েও শিশুর মতো কতো সহজ সরল। আজকাল আবার কেউ বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখালে লোকে অন্যরকম সন্দেহ করে। অথচ তার কাছ থেকে সুন্দরমের কিছুই পাওয়ার নেই। ও'র এই স্নেহ এবং ভালোবাসা নেহাতই প্রাণের টানে। ক্ষীণ একটা ব্যাপার যেটা লুকিয়ে রয়েছে—ও'র ছেলেটা বে'চে থাকলে এতোদিনে তারই বয়সী হতো। হায়রে পিতৃহৃদয়! যে যতো কঠোর এবং কঠিনই হোক না কেন, এই জায়গাতে সে ততো বেশি দুর্বল। সুন্দরমের মানসিকতাটুকু সহজেই বোঝা যায়। অমিতাভ ওর ক্ষতস্থানে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে বললো, আলাপ হবার পর থেকে আপনার কথার অবাধ্য হয়েছি কখনও?

সুন্দরম এবং অমিতাভ প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে যখন কথা

বলছিল হন্তদন্ত হয়ে দুজন লোক এগিয়ে এসেই সুন্দরমকে লম্বা সেলাম ঠুকে মুখেও বললো, নমস্তে সাব।

নমস্তে। সুন্দরম এর পর তামিল ভাষায় ওদেরকে যা বললেন সেটা অবশ্য অমিতাভর বুঝবার ব্যাপার নয়। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় দেখলো, ঐ লোক দুটো তার স্যুটকেস আর হোল্ড-অলটা তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে যাবার পথে পা বাড়িয়েছে। সুন্দরম অমিতাভর দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, এসো অমিতাভ।

মাদ্রাজ সেন্ট্রালের বাইরে সুন্দরমের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। দুজনে উঠে বসতেই ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। মাউণ্ট রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর সুন্দরম হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কোচিনের কোন কোম্পানীতে তুমি জয়েন করছো?

রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানীতে। সামান্য একটু সময় চুপ করে থেকে অমিতাভ সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, আমাকে কিন্তু নামতে বলা হয়েছে এর্নাকুলামে।

কোচিন আর এর্নাকুলামে কোনো পার্থক্য নেই। সুন্দরম ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন, আসলে স্টেশনের নাম এর্নাকুলাম। শহরের নাম কোচিন।

ছবির মতো একটা দোতলা বাড়ির পোর্টিকোর নিচে এসে গাড়ি থামতেই ড্রাইভারেরও আগে ছুটে এসে একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে দিল। সুন্দরম নেমে অমিতাভকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত কাজের লোকদের নমস্কার কুড়োতে কুড়োতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বিশাল এবং সুসজ্জিত ড্রইংরুমে অমিতাভকে বসিয়ে সরোজা সরোজা বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন অবশ্য মিনিট দুয়েক বাদেই। সঙ্গে সরোজা নামের একান্ন-বাহান্ন বছরের এক মহিলা। সুন্দরম পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার স্ত্রী। পরে সরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর অমিতাভর কথা তো এইমাত্র তোমাকে বললামই।

একটা সোফায় বসেছিল অমিতাভ। পরিচয়ের পালা শেষ হলে

সে উঠে দাঁড়ালো। মায়েদের কোনো আলাদা জাত নেই। পৃথিবীর সব মা'ই এক। অমিতাভ আস্তে আস্তে সরোজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সরোজের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। স্বপ্নের এক ছবি এঁকে তিনি কোমল গলায় বললেন, মনেই হচ্ছে না তুমি এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে। তোমাকে আমি এমনিতেই আশীর্বাদ করছি বাবা! তারপরেই স্নেহের সুরে আদেশ, হাত-মুখ ধোয়া নয়, একবারে স্নান করেই এসো। এতোটা জারনি করে এসেছো, শরীরটা ভালো লাগবে।

ড্রইংরুম পার হয়ে একটা বেডরুমের মধ্যে দিয়ে বাথরুমে ঢুকবার মুখে অমিতাভর চোখ দুটো হঠাৎ আটকে গেল। বছর পাঁচেক বয়সের একটা শিশুর দুষ্ট হাসি নিয়ে অসাধারণ সেই ছবিটা যেন সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। ডাবল বেডের পায়ের দিকের প্রায় দেওয়াল জোড়া জীবন্ত ছবিটা দেখে অমিতাভর প্রথমেই মনে হলো, এই খাটে বসে সুন্দরম এবং সরোজা যেন প্রত্যেকদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। কী মধুর সেই হাসি ছেলেটার! যেন সবাইকে হাসতে শেখাচ্ছে।

অমিতাভ বাথরুমে ঢুকে গেলে সরোজা বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। তাঁর ভেতরটা বুঝি হাহাকার করে উঠলো। তবুও নিজেকে চমৎকারভাবে ধরে রেখে শূন্য গলায় বললেন, সময়ের সঙ্গে শোকের আঘাতটা সামলে উঠেছি ঠিক কথা, কিন্তু বিজয়কে ভুলতে পারছি কই? এতো বছর হয়ে গেল……সরোজা আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ঘরের মধ্যে তখন অখণ্ড এক নীরবতা। মিনিট দুই সময় ঐ মৌনতার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলায় সরোজা আবার বললেন, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো? অমিতাভর চোখ দুটো ঠিক আমাদের বিজয়ের মতো।

ট্রেনে ওকে দেখে সেটা আমার মনে হয়েছে সরোজা।

সেইজন্যই অমিতাভকে বাড়িতে নিয়ে এলে? কিন্তু কী লাভ? সরোজা করুণ সুরে বললেন, ও তো মুহূর্তের জন্য এলো আর

আমাদের ভেতরের মনটা অশান্ত থাকবে বেশ কয়েকদিন। যেটাকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে তা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি কেন ?

মন মানলো না সরোজা। সুন্দরমের সরল স্বীকারোক্তি। তারপরেই ছোট্ট প্রশ্নটা করলেন, তুমিই বা ওকে স্নানে পাঠালে কেন ?

ভাবলাম বিজয়ই বুঝি ফিরে এসেছে।

তোমার চিন্তা আর আমার চিন্তাভাবনা কি আলাদা ? সুন্দরম প্রশান্ত হেসে বললেন, আমরা দুজনে যা করছি তা ঐ এক চিন্তা থেকেই। শুধু শুধু মন খারাপ করতে নেই। অমিতাভ মুহূর্তের জন্য এলেও ঐ সময়টুকুই আমরা আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলতে পারি।

মিনিট দশেক আগে অমিতাভর স্নান হয়েছে। ইতিমধ্যে সুন্দরমও স্নান-টান সেরে নিলেন। এখন সকাল আটটা দশ-পনেরো হবে। সময়টা আগস্টের শেষাশেষি। চারদিকে ঝকঝকে রোদের ছড়াছড়ি। নীল আকাশটা যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে ঐ দূরে টাঙানো রয়েছে। অমিতাভ ওরা ভেতরের প্রশস্ত ব্যালকনীতে বেতের সোফায় বসে গল্প করছিল। ওরা বলতে অমিতাভ আর সুন্দরম। দুজন লোকের হাতে খাবারের পাহাড় চাপিয়ে সরোজা সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজেকে সব রকমের বিমর্ষতার ঊর্ধ্বে তুলে সহজ ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, এবারে গল্প বন্ধ করো। সুন্দরমও স্ত্রীর সঙ্গে একটু কৌতুক করলেন। বললেন, আমরা খাওয়ার গল্প নিশ্চয় করতে পারি ?

তাও হবে না। সরোজা হাসির আড়ালে গম্ভীর সুরে আদেশ দিলেন।

আমাদের এখন একটাই কাজ। অমিতাভ সরোজকে খুশি করে বললো, খাবারের এই পাহাড়টাকে মুহূর্তে শেষ করতে হবে।

চমৎকার বলেছো। সরোজার সারা মুখে তৃপ্তির হাসি। আমি ভাবছিলাম অমিতাভ বোধহয় বড্ড লাজুক। একটাও কথা বলবে না।

সত্যি অমিতাভ কথাটা কিন্তু দারুণ বলেছে। সুন্দরম হাসি

ছড়িয়ে বললেন, যদিও আমি খুব একটা খেতে পারি না তবুও অমিতাভর অনারে দেখা যাক—পাহাড়টাকে কতোটা কুপোকাৎ করতে পারি।

পাহাড়ই বটে। সকালের জলখাবারের আয়োজন যে এতো বিরাট হবে অমিতাভর জানা ছিল না। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা বড়ো সাইজের একরাশ মশলা ধোসা। সঙ্গে স্যুপ জাতীয় সম্বর। বাটার টোস্ট। একটা সুদৃশ্য ডিশে গোটা আটেক ডিম। তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো পর্যন্ত ছড়ানো। ডজন দেড়েক কলা। আর একটা বড়ো টুকরিতে তো আপেলের ছড়াছড়ি।

সরোজা ডিশে করে সবকিছু সাজিয়ে দিয়েও বললেন, অমিতাভ, লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু—যা লাগবে এখান থেকে তুলে নেবে।

অমিতাভ বললো, আমি বিন্দুমাত্র লজ্জা করবো না।

এইটাই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা।

আমিও লজ্জা করবো না। সুন্দরম হাসতে লাগলেন।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল। সরোজা কিছু কিছু প্রশ্ন করে অমিতাভর সম্পর্কে জেনে নিলেন। যেমন, ওদের বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছেন, প্রথম চাকরি করতে বেরিয়ে কেমন লাগছে? অবশ্য চাকরির জায়গাতেই এখন পর্যন্ত পেঁছানো গেল না—ওখানে গিয়ে আবার আর এক জীবন। সে যাই হোক, সব জায়গাতেই নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে—সে ব্যাপারেও পরামর্শ দিলেন।

ব্যালকনীর সামনের গ্রীলের ওপর এই সময় একটা কাক এসে বসলো। খাবার টেবিলের এতো কাছাকাছি ঐ কুৎসিত পাখিটা ভাবা যায় না। তাছাড়া কখন কোন ফাঁকে মুখ দিয়ে কী তুলে নিয়ে যাবে কে জানে! অমিতাভ কাকটাকে তাড়াবার জন্য হাত তুলতেই সরোজা ওকে বাধা দিলেন। না-না, তাড়িও না। ও বোবা। অর্থাৎ বোবা কাককে তাড়ানো চলবে না। অমিতাভ মনে মনে একটু হাসলো এবং পরে লক্ষ্য করলো সরোজা বাটার টোস্টের পুরো দুটো পিস আলাদা একটা প্লেটে কোণের দিকে মেঝেতে

রেখে দিতেই কাকটা সেখানে পেঁাছে পরম নিশ্চিন্তে খেতে লাগলো। কলকাতার কাকরা খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সময় ব্যস্ত হয়ে যেমন চারদিকে ঘন ঘন তাকায়, এই কাকটা তেমন কিছুই করলো না। কোনোদিকে না তাকিয়ে একমনে বাটার টোস্ট দুটো শেষ করে সরোজার দিকে তাকালো। কাকটার জন্য বোধহয় আলাদা একটা কাপও রয়েছে। সরোজা ভেতর থেকে সেই কাপটা এনে তাতে জল ভরে ওর কাছে রাখতেই গলা উঁচু করে চার-পাঁচ ঢোক খেয়েই কাকটা বিদায় নিল।

কাকটা কী রোজ আসে?

হ্যাঁ।

এটাই যে বোবা কাক বোঝেন কী করে? অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে সরোজা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই সুন্দরম বলে উঠলেন, ঘটনাটা কী জানো অমিতাভ, ঐ বোবা কাকটার সঙ্গে একদিন আরও তিনটে কাক এসেছিল। সরোজা কিন্তু ওকে চিনে নিতে এতোটুকু ভুল করেনি। আমি অবাক হয়ে ওকে সেকথা জিজ্ঞেস করতেই সরোজার ঐ এক উত্তর, মা কেমন করে তার যমজ সন্তান দুটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে?

বেলা তখন দুটো। টেবিলে ঢাকা দেওয়া অবস্থায় খাবার সাজানো রয়েছে। অমিতাভ ফিরে এলেই একসঙ্গে সবাই খেতে বসবে। ও মাদ্রাজ শহর ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে। সুন্দরম তাঁর ড্রাইভার বাসুদেবনকে এই কাজের ভারটুকু দিয়ে বলেছেন, এই প্রথম মাদ্রাজে এসেছে অমিতাভ। ফাঁকিটাকি দিস না। বেরুবার সময় অমিতাভ সুন্দরম এবং সরোজা দুজনকেই বারবার বলে গেছে, প্লিজ, আপনারা কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়—আপনারা দুপুরের খাওয়া সেরে নেবেন।

তাই কী কখনো হয়? নাই বা হলো অমিতাভ নিজের ছেলে। ছেলের মতো তো বটেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওকে ছেলে বলে ভাবতে মনটা তো খানিকটা শান্তি পাচ্ছে। এইটুকুই বা কম কিসের? সেই অমিতাভকে ফেলে ও'রা দুজনে কী খেয়ে নিতে পারেন? তাছাড়া এতোদিন এই বাড়িতে রমন নামের লোকটাই

রান্না করে এসেছে। দীর্ঘদিন বাদে সরোজা আজ নিজে রান্না করেছেন। অমিতাভ যতোই অনুরোধ করে যাক—কোনো অবস্থাতেই ওকে ফেলে খাওয়া চলে না।

ঘড়িতে যখন তিনটে বাজতে সাত মিনিট বাকি অমিতাভ ফিরলো। এবং যে মুহূর্তে জানতে পারলো ওঁদের দুজনের খাওয়া হয়নি তখন লজ্জা পাওয়া ছাড়া তার আর করণীয় কিছুই ছিল না। একবার শুধু বললো, আপনাদের এতো করে বলে গেলাম তবুও · ···

তবুও খাইনি। সুন্দরম বললেন, যেহেতু তোমার সঙ্গে খাব।

আমরা নিশ্চয়ই খেয়ে নিতাম। সরোজা অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। শেষে বললেন, আসল কথাটা কী জানো? আমরা কেউই ক্ষিদেটাই অনুভব করতে পারলাম না।

খেতে বসে সুন্দরম জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে বলো অমিতাভ, বাসুদেবন তোমাকে কী কী দেখালো?

খুব সিনসিয়ার বাসুদেবন। চলুন স্যার আপনাকে আর একটা জিনিস দেখাই, দাঁড়ান স্যার ওটা বাদ পড়ে যাচ্ছে—এমনি করে করে পুরো মাদ্রাজ শহরটাই সে আমাকে ঘুরিয়ে দেখালো। অমিতাভ এক এক করে বলতে শুরু করলো, প্রথমে দেখলাম সী বীচ্, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস, মেরিন ড্রাইভ, কর্পোরেশন বিল্ডিং, লাইব্রেরি, মোর মার্কেট, নেহরু স্টেডিয়াম, চায়না মার্কেট, পোর্ট, স্টেট ইনফরমেশন অফিস, সেন্ট্রাল জেল, কস্তুরবা হাসপাতাল, বেসিন ব্রীজ পাওয়ার হাউস, চিড়িয়াখানা, এ্যাকোরিয়াম, আরও কতো কী। যখন বাড়ি ফিরছি সেই সময়েও হঠাৎ বাসুদেবনের আক্ষেপ শোনা গেল, স্যার আর দুটো কেন বাদ থাকে?

তোমার আর দুটো কী কী?

মেরিনা বীচ আর আন্নাদুরাই-এর স্ট্যাচু।

ঐ দুটো হলে তোমার মাদ্রাজ শহর কমপ্লিট হবে?

বাসুদেবনের সরল হাসি, হ্যাঁ, স্যা[illegible]

তাহলে চলো।
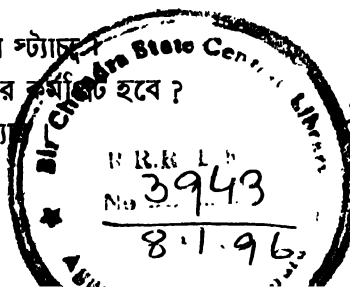
খেতে খেতে অমিতাভ দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। সরোজা এই ফাঁকে ওর ডিশে আরও খানিকটা কড়াইশুঁটি ও কারিপাতার সবজি তুলে দিলেন। অমিতাভ একবার শুধু বলেছিল, জিনিসটা দারুণ হয়েছে। মায়েদের কাছে ভালো বলার এই একটাই সাজা। আরও খেতে হবে। পেট ভরে গেলেও ওজর-আপত্তি খুব একটা টেঁকে না। অমিতাভ ঐ ব্যাপারটা নিয়ে তাই কিছুই বললো না। অর্থাৎ নীরবে মেনেই নিল। তারপর আবার আগের কথায় ফিরে গেল। আসলে এই তিনটের সময় দুপুরের ভাত খেতে বসাটা তাকে খুবই লজ্জা দিচ্ছিল। অমিতাভ বললো, বাসুদেবন মাদ্রাজ শহরের একটা জিনিসও চোখের আড়ালে রাখতে চাইছিল না, আর আমিও তার সঙ্গে সমানে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেছি। ঘড়ির কাঁটাও তাই জোরকদমে এগিয়ে গেছে। একটা দিনের জন্য এসে আপনাদের খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম।

কথাটা খুব মন দিয়ে শুনলেন সরোজা। অল্প একটু হাসলেন কি হাসলেন না। বললেন, কষ্টের ব্যাপারটা তো আমাদের। ওটা যদি আমরা না পাই তোমার মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তুমি যে আমাদের মন খারাপ করে দিলে। কষ্ট তো এই মুহূর্তে পেলাম।

অমিতাভর উজ্জ্বল মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। সে রীতি-মতো নার্ভাস হয়ে গেল। খাওয়া বন্ধ করে সে সরোজার দিকে কিছুক্ষণ অসহায় হয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাদের কি কোনোরকম আঘাত দিয়েছি?

ঐ যে তুমি বললে, 'একটা দিনের জন্যে এসে—'

হ্যাঁ, বলেছি, কিন্তু—অমিতাভ তখনও বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। আসলে সে ধরতেই পারছে না ঐ কথাটার মধ্যে তার গলদটা কোথায়?

সরোজা বিষণ্ণ গলায় বললেন, তুমি কি ধরেই নিয়েছো এই একটা দিনের জন্যই আমাদের বাড়িতে এসেছো? আর কখনও এখানে আসবে না?

ব্যাপারটা এতোক্ষণে বোঝা গেল। বেলা তিনটের সময় খেতে বসার জন্য অমিতাভ যতো না লজ্জা পেয়েছিল, তার চেয়েও হাজারো গুণে বেশি লজ্জায় পড়লো এখন। সে অনুতপ্ত হয়ে নিচু সুরে বললো, ওটা বলা আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

ভুল স্বীকার করছো ?

অমিতাভ উত্তর না দিয়ে এবারে হাসতে লাগলো। সরোজাও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন, এই বাড়ির মানুষ দুটোকে শান্তি দিতে তুমি মাঝে মাঝে এসো। তার বেশি কিছু চাই না। অমিতাভ শুধু ভাবলো, কতো মানুষের কতো রকমের চাহিদা। চাহিদার অবশ্য পার্থক্য রয়েছে। তবে সেসবের অধিকাংশই নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করার তাগিদে আকাশের কাছাকাছি পেঁছে যাওয়ার প্রচেষ্টা। অথচ এই মহিলার চাহিদাটুকু অনায়াসেই চোখে জল এনে দেয়। এতো আন্তরিক আবেদন মনকে সহজেই উতলা করে স্নেহের বৃষ্টিও ছড়িয়ে দেয়। অমিতাভ বললো, আমি নিশ্চয়ই আপনার কথা রাখবো।

এখন সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ছটা। আর দেরি করার উপায় নেই। সাতটা দশে কোচিন এক্সপ্রেস ছাড়বে। মিনিট কুড়ি সময় মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে পেঁছাতে লাগবে। বাকি কুড়ি মিনিট সময় তো হাতে রাখতেই হয়। আসলে দুপুরের ঐ খাওয়া-দাওয়ার পর অমিতাভ নিটোল একটা ঘুম দিয়েছে। সময় মতো উঠতেই পারতো না। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজারও বেশ মায়া লাগছিল। কিন্তু না ডেকে উপায়ই বা কী? ঘুম ভাঙানোর মতো বাজে কাজটা তাই সরোজাকেই করতে হলো।

বিকেলে খাবারের আয়োজনও কম ছিল না। কিন্তু অমিতাভর বিন্দুমাত্র খিদে ছিল না। সুতরাং খাবার প্রশ্নই নেই। সরোজার অনুরোধে সে শুধু এক কাপ কফি খেল। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিল। নিচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাসুদেবন। সরোজা এবং সুন্দরম পোর্টিকোর

কাছে গিয়ে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়লেন। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কয়েকটা মুহূর্ত মিশে যাওয়ার পর সুন্দরম নিজেকে আবিষ্কার করে বললেন, গাড়িতে ওঠো অমিতাভ।

আপনি যাবেন না? অমিতাভর হিসেবের মধ্যে এটা ছিল না। যিনি তার জন্য এতো কিছু করলেন, সন্তান স্নেহ দিলেন, তিনি যে বিদায় জানাতে স্টেশনেও যাবেন এটাই স্বাভাবিক। অথচ উনি তাকেই শুধু গাড়িতে উঠতে বলছেন। সারাদিনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই ব্যাপারটা মানানসই হয়ে উঠতে পারলো না বলেই অমিতাভ মনে মনে একটা ধাক্কা খেল। সত্যি কথা বলতে কী, সে বেশ, ভেঙেই পড়লো। এবং এমনটা হওয়ার ফলে সম্ভাব্য কারণগুলোর জন্য সে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো।

প্রিয়জনদের আমি কখনো সী-অফ করতে যাই না। সুন্দরম অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য একটু হেসে অন্য এক গলায় বললেন, রেকর্ডটা ভাঙতে গিয়ে ভেসে যেতেও তো পারি। সেটার প্রয়োজন কী বলো?

অমিতাভ পলকহীন চোখে সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। সময় আর বিশেষ নেই দেখে কোনোরকম কথার মধ্যে গেল না। সুন্দরমের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সরোজাকেও প্রণাম করলো। বললো, আসছি তাহলে।

এসো। সরোজার ঠোঁট দুটো কী কাঁপছে? নাকি নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন? অমিতাভ জানতে চাইলো, আমায় কিছু বলবেন না?

সে তো আগেই বলে দিয়েছি। মাঝে মাঝে এসো।

সুন্দরম বললেন, নাও অমিতাভ—আর দেরি কোরো না। উঠে পড়ো। অমিতাভ গাড়িতে উঠে বসতেই বাসুদেবন মুহূর্তে অদৃশ্য হবার খেলাটা ভালোই দেখালো।

স্টেশনে পৌঁছেও বাসুদেবন সৌজন্য দেখাতে পিছিয়ে রইলো না। সেলাম জানিয়ে বললো, আবার স্যার আপনার মাদ্রাজে ফিরে আসার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকবো। আর হ্যাঁ—রাতের জন্য এই খাবারটা মা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা নিন

স্যার। অমিতাভ দেখলো বাসুদেবনের হাতে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টীলের একটা মাঝারি সাইজের টিফিন ক্যারিয়ার। অপরিসীম এক কৃতজ্ঞতায় অমিতাভর গলাটা বুজে এলো। সে কোনো কথা বলতে পারলো না। হাতটা শুধু বাড়িয়ে দিল।

কোচিন এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে অমিতাভ শুধু অবাক নয়, বিস্ময়ে প্রায় বোবাই হয়ে গেল' যদিও কথা বলার কোনো প্রশ্নই ছিল না। হাওড়া স্টেশন থেকে যে মেয়েটি সারাক্ষণ বইয়ের পৃষ্ঠায় মুখ গুঁজে মাদ্রাজ পর্যন্ত এসেছিল সেই মেয়েটিই কোণের আসন নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। হাওড়া থেকে মাদ্রাজের পথে সে তুঁতে রংয়ের শাড়ি ব্লাউজ পরেছিল। এখন কিন্তু অন্য পোশাক। এই মুহূর্তে তার পরনে হালকা চকলেট কালারের চোস্ত এবং ঐ কালারেরই কামিজ। ভরাট বুকের ওপর স্বচ্ছ একটা ওড়না। চুলের সেই বিশাল ঢলকে সামলাতে কাঁধের কাছে চকলেট কালারের একটা ফিতে দিয়ে যদিও গিঁট বাঁধা কিন্তু তারপরেই তার সারা পিঠ এবং কোমর ছাপিয়ে যথারীতি দুরন্ত ঢেউ। সরু ভ্রূদুটির ঠিক মাঝখানে বেশ বড়ো রকমের একটা খয়েরি টিপ। ডাগর ডাগর চোখ দুটো যেন কাজলকালো এক স্বপ্নের দ্বীপ। পাতলা দুই ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের আলগা বাহার। আগের দিন নাকছাবি ছিল না। অমিতাভর স্মরণশক্তি এতো কম নয়। আজ সে লক্ষ্য করলো ওর ডান নাকে সাদা পাথরের নাকছাব। মেয়েরা তো সাধারণত নাকের বাঁ দিকেই ওটা পরে। এটাই হয়তো ওর বিশেষত্ব। দুই কানে খয়েরি পাথরের দুটো বড়ো টাব এবং তিন ভাঁজের সুন্দর গলায় খয়েরি সুতোর মোটা হারে মেয়েটিকে সৌন্দর্যের অলৌকিক এক দেবী বলে মনে হচ্ছে।

অবাক হওয়ার পালাটা একটু থিতিয়ে আসতেই অমিতাভর মনে হলো মেয়েটা যে মাদ্রাজ পর্যন্তই আসবে এমন তো কোনো কথা হতে পারে না। সে এই ট্রেনে যেতেই পারে। এমনকি কোচিন পর্যন্তও সে যেতে পারে। অমিতাভ সেসব নিয়ে মাথা ঘামালো না। মোনালিসার সৌন্দর্য নিয়ে মেয়েটি সব কিছুকেই

কেমন অবলীলায় যেন উপেক্ষা করে চলেছে। অমিতাভর লাগছে ঠিক এই জায়গাতেই। ট্রেনে ওঠার সময় মোনালিসা তাকে দেখেও যেন দেখলো না। এতোটা অচেনার ভান করাটা কি ঠিক? অমিতাভর মনে হলো এটা স্রেফ ইচ্ছা করে। স্বাভাবিকভাবেই তো প্রশ্ন করা যেতো, কথা বলা যেতো। অবশ্য এটা ঠিক, সে যে কোচিন যাচ্ছে—সুন্দরমের সঙ্গে আলোচনার সময় মোনালিসা তা আগেই জেনে গেছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করার কোনো ব্যাপারই থাকতে পারে না। মোনালিসা কি প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন মেপে মেপে চলে? অমিতাভ কিছুটা হতাশ হলো। অন্য কিছু নয় —দীর্ঘ এতোটা পথ চুপচাপ না থেকে গল্প করে গেলে নিশ্চয়ই সেটা সময় কাটানোর পক্ষে খারাপ হতো না। সহজভাবেই একটা প্রশ্ন উঁকি দিল, মোনালিসা স্বাভাবিক তো? না, অমিতাভ এতোটা ভোঁতা নয়। তার সঙ্গে কথা বললেই ও স্বাভাবিক এবং না বললেই অস্বাভাবিক এমন মোটা চিন্তাধারা তার নয়। এটা ভাবছে সে পারিপার্শ্বিক ছবিটা দেখেই। তার কথা আলাদা —মোনালিসা তো অন্য যাত্রী বা যাত্রিণীদের সঙ্গেও একটু আলাপ করতে পারতো? ষাট-বাষট্টি ঘণ্টার জারনিটা আর যাই হোক, বোবা হয়ে থাকার প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই নয়। নাকি এটা এক ধরনের অহঙ্কার? সবাইকে ছোট ভাবা এবং ছোট দেখার উন্নাসিকতা। ওর এতো দম্ভের উৎসটা কী? আবার এও তো হতে পারে, অমিতাভ যা ভাবছে মোনালিসা আদতেই তা নয়। সে শুধু আশ্চর্য রকমের শান্ত এবং লাজুক। যেচে কারো সঙ্গে কথাই বলতে পারে না।

কোচিন এক্সপ্রেস সঠিক সময়েই ছাড়লো। অমিতাভ প্রথমেই একটা সিগারেট ধরালো। ওর মুখোমুখিই রয়েছে মোনালিসা। সুতরাং সিগারেটের ধোঁয়ার ব্যাপারটা যাতে ওকে বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হলো। একটা অল্পবয়সী ছেলে কফি বিক্রি করছিল। সে অমিতাভর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কফি সাব?

নেহি।

আচ্ছা হ্যায় সাব। বড়ীয়া কফি।

অমিতাভর খুব একটা ইচ্ছে করছিল না খেতে। ভালো-মন্দের প্রশ্নটা তো পরের ব্যাপার। কিন্তু ছোট ছেলেটার অনুরোধ রাখতেই হলো। সেই সময়েই হঠাৎ অমিতাভর মনে হলো, আচ্ছা মোনালিসাকে বললে কেমন হয়? এতোক্ষণ কোনো কথা হয়নি ঠিক কথা। কিন্তু কথা বলাই চলবে না—এমন নিষেধাজ্ঞাও নেই। 'আপনি কি কফি খাবেন' বলাটা অনায়াসেই করা যেতে পারে। বিশেষ করে হাওড়া থেকে এতোটা পথ একসঙ্গে আসার পর যে কোনো মানুষই এটুকু ভদ্রতা দেখাতে পারে। কথাটা বলতে গিয়েও অমিতাভ পারলো না। আত্মমর্যাদার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বটা ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। মোনালিসা নিশ্চয়ই বাড়তি কথা বলা পছন্দ করে না। সে কেন সহজ হতে যাবে? অমিতাভ একা একাই কফি খেতে লাগলো। ছেলেটা এবারে মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করলো, মেমসাব, কফি দুঁ? মোনালিসা জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। সে ছেলেটার মুখের দিকেও তাকালো না। গালের ওপর মাছি তাড়াবার ভঙ্গিমায় সে শুধু বাঁ হাতটা একটু নাড়িয়ে দিল। ছেলেটা আচ্ছা কফি বা বড়ীয়া কফি ইত্যাদি বলার আর সাহসটুকু পর্যন্ত পেল না। অমিতাভ নিজের বিবেচনাকে একটু বেশি পরিমাণেই ধন্যবাদ জানালো। ভাগ্যিস মোনালিসাকে কফি খাওয়ার কথা বলেনি।

কোয়েম্বাটোরে এসে কোচিন এক্সপ্রেসটা থামতেই বিচিত্র সব আওয়াজে মনে হতে পারে, স্টেশনটা বুঝি 'গো এজ ইউ লাইকে' নাম দিয়েছে। ট্রেনটা এখানে মিনিট দশেক দাঁড়াবে। অমিতাভর সিগারেট কেনার প্রয়োজন ছিল। সেটা অবশ্য সিটে বসেই পেতে পারে, তবু সে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নামলো। এদিক-ওদিক একটু পায়চারিও করে নিল। রেলওয়ে স্টল থেকে দু-প্যাকেট সিগারেট কিনলো এবং অবশ্যই একটা দেশলাই। ঐ একটা ব্যাপারে অমিতাভ ভীষণ সজাগ। যারা দেশলাই কেনে না তাদেরকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অতো দামের সিগারেট খাওয়া চাই অথচ

কুড়ি-পঁচিশ পয়সার একটা দেশলাই কিনতেই যতো রাজ্যের কৃপণতা! আসলে ওটা সুবিধাবাদী মনোভাব।

অমিতাভ ট্রেনে এসে বসলো। মোনালিসা একটা কলাপাতার মোড়কে দইভাত জাতীয় কি যেন খাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছে। অমিতাভর কিন্তু তেমন একটা ক্ষিদে নেই। অথচ সরোজা এক টিফিন ক্যারিয়ার খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠলো। সুন্দরম এবং সরোজার সঙ্গে আলাপ হওয়া এবং তাঁদের স্নেহের ছায়ায় প্রায় সারাটা দিন কাটানো কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। কতো স্বল্প আলাপে কি বিরাট গভীরে মিশে যাওয়া-ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য! অথচ এটা সত্যের খুবই উজ্জ্বল ছবিটা অমিতাভ সারাজীবন নিজের মনের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে।

মোনালিসার খাওয়া শেষ। জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে কলাপাতাটা ফেলে জলটল খেয়ে হাত-মুখ মুছে নিল। সাইড ব্যাগটা খুলে কি যেন খুঁজলো। তারপর পাশের মোটা মতো একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে মালয়লম ভাষায় কয়েকটা কথা বলেই ট্রেনের সরু প্যাসেজ দিয়ে কম্পার্টমেণ্টের শেষ মাথার দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এলো মিনিট তিনেক পরেই। কোয়েম্বাটোর ছেড়ে ট্রেনটা তখন স্পীড নিতে শুরু করেছে। মোনালিসা আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় মন দিল।

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার পাশেই ততোধিক বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। খুব সম্ভব ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। নতুন জায়গায় যাওয়ার স্বাভাবিক কৌতূহলে অমিতাভ প্রতিটা স্টেশনের নামগুলো পড়বার জন্য বারবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল। কোনোটা পড়তে পারছে, কোনোটা আবার পারছে না। ট্রেন বেশ ভালো গতি নিয়েই ছুটে চলেছে। এক পলকে পড়ে নিতে তাই একটু অসুবিধে হচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করে অমিতাভকে ইংরেজীতে এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন?

এর্নাকুলাম, মানে কোচিন। অমিতাভও একই ভাষায় উত্তর দিল।

সে তো অনেক দেরি। বৃদ্ধ হাসলেন। আপনি কাল ভোরে অর্থাৎ পৌনে নটা-নটা নাগাদ সেখানে পৌঁছাবেন।

আপনি কতোদূরে যাবেন?

আমরা এ্যালোবাই নেমে যাবো। আপনার থেকে ঘণ্টা দুয়েক আগেই নামবো। বৃদ্ধ একটু চুপচাপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আসছেন কোথা থেকে?

কলকাতা।

আপনি কি বাঙালী?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

আপনাকে দেখে কেন জানি আমার সেকথাই মনে হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম। ছোটরা যেমন ডুব-সাঁতার কাটতে গিয়ে মাঝে মাঝেই মাথা তোলে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর থেমে থেমে এক একটা প্রশ্ন করে চলেছেন। আপনি নিশ্চয়ই কোচিনে এই প্রথম যাচ্ছেন?

আপনি ঠিকই ধরেছেন।

বেড়াতে যাচ্ছেন না চাকরিতে?

আমি ওখানে চাকরি পেয়েই যাচ্ছি।

মিনিট দুয়েক মৌন থাকার পর ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন। কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন? প্রশ্নটা শুনে অমিতাভ সামান্য একটু হাসলো। বললো, নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন? আমি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে থাকি। আপনি কলকাতায় গেছেন কোথায়?

আমি যাইনি। তবে আমার এক ভাই কলকাতায় থাকে। নেহরু কলোনীতে। আপনি চেনেন নেহরু কলোনী?

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললো, সারা ভারতবর্ষটাই তো নেহরু কলোনী। আপনি ঠিক কোন জায়গাটার কথা বলছেন?

টালিগঞ্জের নেহরু কলোনী। আপনি গিয়েছেন ওদিকে?

গিয়েছি। ছোট্ট ঐ উত্তরটা দিয়ে অমিতাভ ভাবতে বসলো, বৃদ্ধ হলে কী একটু বেশি কথা বলার প্রবণতা থাকে? এর আগেও সে তিন-চারজন বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করেছিল। তাঁরা সমানে

কথা চালিয়ে গিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, তাঁরা প্রায় থামতেই চান না। এটা কি নিঃসঙ্গতা থেকে আসে? এটা ঠিক, বুড়ো মানুষদের সঙ্গে কেউ বড়ো বেশি একটা কথা বলতেই চায় না। তাঁদেরকে এড়িয়ে চলাই হয়। সেই কারণেই হয়তো কথা বলার সুযোগ পেলে তাঁরা এতো মুখর হয়ে ওঠেন।

এখন মোটামুটি সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু দুজন ছাড়া। নিচের বিছানায় মোনালিসা যদিও শুয়ে রয়েছে সে কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। বই পড়ছে। অমিতাভ শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেয়ে চলেছে। তার বিন্দুমাত্র ঘুম আসছে না। মোনালিসার বই পড়ার আগ্রহ দেখে এটা স্বীকার করে নিতেই হলো যে ওটা ছাড়া সময় কাটানোর বড়ো ওষুধ আর নেই। ওর কাছে বেশ কয়েকটা বই রয়েছে। অমিতাভ একবার ভাবলো চাইলে কেমন হয়? দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হাওড়া থেকে ও তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। এমনকি ভালো করে একবার তাকিয়েও দেখেনি—এই ব্যাপারটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বই চাওয়ার উৎসাহটা অমিতাভ মুহূর্তে হারিয়ে ফেললো। ঐ মেয়ের কাছে সে কিছুতেই আগে এগিয়ে যেতে পারবে না। ওর এতো অহঙ্কার থাকলে তারই বা থাকবে না কেন? এই একট্য ব্যাপারে অমিতাভ আর পাঁচজন ছেলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একজন সুন্দরী ঝকঝকে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে কার না ভালো লাগে? সেজন্য অতি সহজ উপায়ে গায়ে পড়ে আলাপ করাটা তার রুচিতে বাধে। রুদ্র তার সহপাঠী ছিল। একসঙ্গেই এম কম. পাশ করেছে। সে তো প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে শ্যামলীর পেছনে পড়েছিল। লজ্জা লাগতো অমিতাভর। বন্ধুকে এর জন্য সে নেহাৎ কম শাসায়নি। তুই কি রে? মেয়েটা তোর দিকে ফিরেও তাকায় না। খুব সম্ভবত সে তোর কাণ্ডকারখানা দেখে ঘৃণাই করে। আর তুই কিনা হিমালয়ের চূড়ায় বসে থাকা সেই মেয়ের কাছেই ধর্ণা দিচ্ছিস? আত্মসম্মান না থাকলে আত্মহত্যা কর, বুঝলি—

আমি বুঝেছি। তুই কিছুই বুঝিসনি। রুদ্র হেসে উত্তর দিয়েছিল। তোর মতো ভ্যানতাড়া টাইপের ছেলেদের মুখ মেয়েরা

দেখতেও চায় না। যতোই সোবার ঢঙে কথা বলো আর রুচি-টুচির পরিচয় দাও না কেন—ওরা এই পেছনে লেগে থাকার ব্যাপারটাই পছন্দ করে। বরফ একবার গলতে শুরু করলে চালাও পানসি গোয়া টু বেলঘরিয়া। মিলেমিশে তখন সবকিছু একাকার।

ব্যাপারটা সত্যিই তাই হয়েছিল। অমিতাভ যখন ভাবতে শুরু করেছিল রুদ্রটা যে কোনোদিন মার খেতে পারে তখনই একদিন সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো ওদের সম্পর্কটা গাঢ় হওয়ার দিকেই গড়াচ্ছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখছে, কফি হাউস থেকে বেরুচ্ছে, মুহূর্তমাত্র সময় পেলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে এবং তাকে দেখে ওরা দুজনেই যথারীতি হাসাহাসি করছে। পরে অবশ্য রুদ্র একদিন বলেছিল, তুই কিন্তু বাচ্চাই রয়ে গেলি অমিতাভ। মেয়েদের প্রাথমিক এই অবজ্ঞার ভাব দেখে তুই ভড়কে গিয়েছিলি। শ্যামলী বুঝি এই আমাকে পেটাতে আসছে। এখন কে কাকে পেটাচ্ছে বুঝতে পারছিস তো? বাড়িতে পর্যন্ত টিকতে দিচ্ছে না। শুতে যাবার আগে রাত এগারোটার সময়েও একবার ফোন করবে। তাই বলছিলাম, তোর রুচি নিয়ে তুই থাক বাবা তোর কথা শুনলে শ্যামলীর সঙ্গে এ জীবনেও আলাপ হতো না।

নতুন করে ভাবতে লাগলো অমিতাভ। এটাও কি মেয়েদের এক ধরনের ভণিতা? খুব সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সবচেয়ে ভালো উপায়? প্রথমে গম্ভীর থাকো, পরে কথার বৃষ্টি ঝরিয়ে দাও। শুরুতে ভাও বাড়াও, শেষে দাঁও মারো। না, ওসব থেকে অমিতাভ কোনোরকম শিক্ষাই নেবে না। যে কথা বলতে অনিচ্ছুক—তার সঙ্গে কোনো কথা নয়। যে অতো উদাসীন হতে পারে তার প্রতি আগ্রহ থাকাটাও যুক্তি নয়। সুতরাং মোনালিসার কাছ থেকে বই চাওয়ার ইচ্ছেটাকে বাতিল করে দিয়ে অমিতাভ ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

ভোরবেলা যখন ওর ঘুম ভাঙলো ট্রেনটা তখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অমিতাভ মুখ বাড়িয়ে দেখলো এ্যালোবাই। এই

স্টেশনে তো বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার নামার কথা। অমিতাভ দেখলো ও'রা ও'দের আসনে নেই। অর্থাৎ নেমে গেছেন। সেখানে অন্য দু'জন যাত্রী বসে আছে। অমিতাভ মুখটুখ ধুয়ে এলো। গতকাল রাতে খাওয়ার পরেও টিফিন ক্যারিয়ারে গোটা চারেক ইডলি রাখা ছিল। অমিতাভ একটাতে সামান্য একটু কামড় বসিয়ে দেখলো নষ্ট হয়েছে কিনা। সেগুলো ভালো থাকাতে চটপট সে খেয়ে নিল। তারপরে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্ল্যাটফরম থেকে কফির গেলাসটা নিয়ে ছেলেটাকে পয়সা মিটিয়ে দিল। এই লাইনে অমিতাভ একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, চা প্রায় পাওয়াই যায় না। কফি আর কফি। এখানকার মানুষরা নিশ্চয়ই কফিভক্ত। সে এতোক্ষণ খেয়াল করেনি। মোনালিসার হাতেও একটা পিকনিক গেলাস। ছোট ছোট চুমুক বসিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে কফি খাচ্ছে।

অবশেষে এর্নাকুলাম। নটা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকি। ট্রেনটা গজরাতে গজরাতে একসময় শান্ত হয়ে একেবারেই থেমে পড়লো। আর তারপরেই শুরু হলো প্ল্যাটফরমে নামার ব্যস্ততা। ঠিক এইখানেই কেউ কাউকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। এই সময়েই মানুষ বড়ো বেশি উতলা হয়ে ওঠে। সবাই সবার আগে নামতে চায়। ধীরেসুস্থে প্ল্যাটফরমে যখন অমিতাভ নামলো, মোনালিসাও নামছে। তার আয়ত চোখ দুটো এখন রোদ-চশমায় ঢাকা। মাছ যেমন জলে অনায়াসে খেলা করে মোনালিসাও তেমনি স্বচ্ছন্দ গতিতে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। ওর চলার ছন্দে কোনোরকম জড়তা না থাকায় অমিতাভর ধারণা হলো ও নিশ্চয়ই এখানকারই মেয়ে।

অমিতাভ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দেখলো মোনালিসা দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও কিছু কিছু যাত্রী। বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভাররা যাত্রীদের ঘিরে থেকে জানতে চাইছে কে কোথায় যাবে? কেউ কেউ চলেও যাচ্ছে। অমিতাভ দু-চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো স্টেশনের বাইরের এলাকাটা। যেদিকেই তাকাও শুধু নারকেল গাছ আর নারকেল গাছ। চারদিকে যেন সবুজের

ছড়াছড়ি। আপনা থেকেই চোখ দুটো ক্রমশ স্নিগ্ধ হয়ে আসে। অমিতাভর মনে হলো গোটা কেরলই বুঝি সবুজ রংয়ের আবিরে স্নান করে উঠেছে। সবুজ সুন্দরী।

ইতিমধ্যে একটা অ্যামবাসাডার এসে মোনালিসার সামনে দাঁড়ালো। চালকের আসনে একজন বছর পঞ্চান্নর ভদ্রলোক। ব্যাক-ব্রাশ করা একমাথা সাদা-কালো চুল। কপাল থেকে নেমে আসা টানা নাকের ওপর সোনালী ফ্রেমের চশমা। প্রশস্ত কপালে সাদা ছাই অথবা বিভূতি জাতীয় কী একটা টিপ। পরনে সাদা ঝকঝকে হাফ-শার্ট। লুঙ্গি না ফুলপ্যাণ্ট সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোকের সৌম্য চেহারা দেখে অমিতাভর মনে হলো উনি খুব সম্ভব ওর বাবা। মোনালিসা ওঁকে দেখে মৃদু একটু হাসলো। কিন্তু কি মোহনীয় সেই হাসি! হাসলে মানুষকে এতো সুন্দর দেখায়! অমিতাভ ভাবলো এই কি সেই মোনালিসার হাসি!

ভদ্রলোক ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেতেই অমিতাভর মোনালিসা-জ্বর ছাড়লো। ইমোশানাল ব্যাপারটা চুকে গেছে। তাকে এখন প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানীর কলকাতা অফিস থেকে তাকে বলা হয়েছে ত্রিপুনীথুরা অঞ্চলের হোটেল বালসাম্মাতে উঠতে। সুতরাং অমিতাভর এখন প্রথম কাজই হলো ঐ হোটেলটি বের করা। সে ট্যাক্সি এবং অটো স্কুটারের দিকে চোখ বোলাতেই দু-একজন চালক আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলো। কিউ সাব, যানা কিধার হ্যায়?

ত্রিপুনীথুরা।

তো আইয়ে, মেরা গাড্ডীপে—ত্রিপুনীথুরা কাঁহা যানা হ্যায়?

হোটেল বালসাম্মা।

চলিয়ে।

ত্রিপুনীথুরা চৌরাস্তার মুখেই হোটেল বালসাম্মা। দোতলা। সব মিলিয়ে চল্লিশটার মতো ঘব আছে। ওটা যে একটা বিরাট হোটেল ঠিক তা নয়। তবে মাঝারিয়ানার মধ্যে মোটামুটি ভালোই বলতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চার রাস্তার জমজমাট এলাকায়

হয়েও হোটেলটার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এমন নির্জন এবং শান্ত পরিবেশ ভেতরে না এলে বোঝাই যায় না। হোটেলের চারধারে নারকেল কুঞ্জের ছায়া আর পান্থপাদপ গাছের সারি যেন হাতছানি দিয়ে ইশারায় কাছে ডাকে। মনে হয় বালসাম্মা হোটেল নয়—নির্জন বনভূমি।

অমিতাভ হোটেলের পঁচিশ নম্বর ঘরখানা পেল। রাস্তার দিকে দক্ষিণমুখি ঘর এটা। বারান্দায় দাঁড়ালে কেরল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস, ট্যাক্সি, স্কুটার এবং সাইকেলের চলন্ত ছবির সঙ্গে চোখে পড়ে হাজারো মানুষের মিছিল। এতো ব্যস্ত এলাকা হয়েও আশ্চর্য রকমের শীতল। পুরো ব্যাপারটা অমিতাভর ভালোই লাগছে। কানের গোড়ায় অজস্র চিৎকার আর হৈ হট্টগোল কে আর পছন্দ করে? অথচ এই ত্রিপুনীথুরাতে সেটাই বেশি করে হওয়ার কথা। হাট-বাজার, ছোট, মাঝারি এবং বড়ো বড়ো সব দোকান, হোটেল রেস্টুরেন্টের ভিড়। সেলুন, লণ্ড্রী, বিভিন্ন নামী-দামী মিলের শো-রুম, কি নেই এখানে? দূরপাল্লার কিছু কিছু বাস পর্যন্ত এই ত্রিপুনীথুরা থেকে ছাড়ে। অথচ জোয়ার এবং ভাঁটার মাঝখানের সময়টুকুর মতোই নিশ্চুপ গতিতে সবকিছু এগিয়ে চলেছে। তবে যানবাহনের হর্নের আওয়াজে এলাকাটা মাঝে মাঝে যা একটু সচকিত হয়ে ওঠে। চার রাস্তার মাঝখানে দুজন ট্রাফিক পুলিশ অবশ্য সারাক্ষণই গাড়ির ঐ ভিড়কে নিজেদের কন্ট্রোলে রেখে বিন্দুমাত্র জট পাকাতে দিচ্ছে না। অমিতাভ ভাবলো, আহা, এদেরকে একবার কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে হয় না! কলকাতা তাহলে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারতো!

হোটেলের ঘরখানা ছোটর মধ্যে বেশ ছিমছাম, গুছানো। সিঙ্গল খাট। পুরু ফোমের নরম বিছানা। সবুজ নেটের মশারি। সব মিলিয়ে অমিতাভর এক্ষুণি একবার ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। ঘরের এক কোণে একটা স্টীলের আলমারি। আর একপাশে প্রমাণ সাইজের ড্রেসিং টেবিল। দুটো চেয়ার এবং একটা সেন্টার টেবিলও রয়েছে। পুরো ঘরখানা কাঁচ কলাপাতা রংয়ের হওয়াতে এই রাজ্যের সবুজ বনানীর সঙ্গে বেশ মানানসই হয়ে

উঠেছে! ঘরটা পঁচিশ নম্বর বলে অমিতাভ মনে মনে একটু হাসলো। তার বয়সটাও পঁচিশ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও পেয়েছে ঐ একই তারিখে। মোনালিসার বয়সটাও খুব সম্ভবত পঁচিশই! তাকে বোধহয় পঁচিশেই পেয়েছে। যাই হোক, ব্যাপারটাকে সবদিক দিয়েই শুভ বলে মনে হচ্ছে। এখন দেখা যাক কতোদূর কি হয়? কেননা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নেবার সময় খুব সঙ্গত কারণেই দু-একটা প্রশ্ন মনে হয়েছে। অমিতাভ অবশ্য কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। তার চাকরির প্রয়োজন ছিল, সে সেটাই গ্রহণ করেছে।

একটা বছর ধরে সে শুধু চাকরির পেছনে ছুটেছে, ঘুরেছে। বহু অ্যাপ্লিকেশন করেছে, বহু ইন্টারভ্যু দিয়েছে কিন্তু কোথাও কিছু হয়নি। প্রতিটা পরীক্ষায় তার মার্কস মোটামুটি ভালোই। দু-একটা জায়গায় যে খারাপ হয়নি তা নয়—তবে ইন্টারভ্যুগুলো ও ভালোই দিয়েছে। কিন্তু কি এক রহস্যময় কারণে ঐ একটা বছরেও অমিতাভর চাকরি হয়নি। জানাশোনা সবাইকে বলা ছিল। কেউ কেউ চেষ্টা করেছে, কয়েকটা খোঁজও দিয়েছে কিন্তু সবই বৃথা।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন রাখালকাকা তাকে খবর পাঠালেন। 'অমিতাভ, শীগগির চলে আয় আমাদের অফিসে। আমাদের বড়োসাহেব আজ কোচিন থেকে এখানে আসছেন। দেখি কি করতে পারি।

রাখালকাকা অমিতাভর নিজের কেউ নন। কোনোরকম আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই। বয়স এই সাতান্নর মতো। পাড়ার ছোট-বড়ো সবাই ওঁকে রাখালকাকা বলেই ডাকে। এমনও দেখা গেছে বাবা এবং ছেলে দুজনই তাঁকে একই সম্বোধন করে। রাখালকাকা মাঝে মাঝে শুধু একগাল হেসে বলেন, যা বাব্বা, তোর বাপের কাকা, তোরও কাকা! আমার ছেলেমেয়ে নেই, তাই বাঁচোয়া। নইলে ওরাও বোধহয় আমাকে তাইই ডাকতো। যাই হোক, রাখালকাকা চাকরি করেন বিখ্যাত রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানীর কলকাতা শাখায়। সিনিয়র ক্লার্ক। কোম্পানীর সারা ভারত জুড়ে কাজ।

রাখালকাকার অফিসে গিয়ে অমিতাভ মোটামুটি যা জানতে পারলো তা হলো এই রকম: তাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ নামবিয়ার যদিও কোচিনেই থাকেন কিন্তু অফিসের কাজে মাঝে মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন শহরে যেখানে যেখানে তাঁদের অফিস রয়েছে সেখানে আসেন। এর আগের বার যখন উনি কলকাতায় এসেছিলেন রাখালকাকা তাঁকে অনুরোধ করে রেখেছিলেন। উনি বলেছিলেন, পরের বার এসে দেখবো। মাস দেড়েক পর মিঃ নামবিয়ার আজ আবার আসছেন। ক'দিন এখানে থাকবেন না থাকবেন কিছু বলা যায় না। রাখালকাকা তাই ফার্স্ট আওয়ারে খবর পেয়েই অমিতাভকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সেদিন ঘন্টা তিনেক অপেক্ষা করার পরেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ এম. ডি. মিঃ নামবিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তবে উনি হাজারো কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও রাখালকাকাকে পি-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল বেলা এগারোটার সময় তিনি দেখা করবেন।

সেই অনুযায়ী রাখালকাকা অমিতাভকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন দশটা থেকেই অফিসে এসে বসে রইলেন। না, সময়ের একটুও এদিক ওদিক হয়নি। মিঃ নামবিয়ার ঠিক এগারোটার সময়েই ওদেরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। রাখালকাকা তোতাপাখি পড়ানোর মতো আগেই একটা কথা অমিতাভকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, আর যাই করো সাহেবি কায়দায় নমস্কার-টমস্কার কোরো না। বাঙালীর ছেলে, স্রেফ বাংলা মতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটি সেরো। কী বুঝলে?

মিঃ নামবিয়ারের পায়ে গড়াগড়ি খেতে হবে আর কী?

আমি কি তোমাকে তাই বললাম? রাখালকাকা অসন্তুষ্ট হলেন। যে সাহেবের এক কথায় চাকরি হতে পারে—তাঁকে এটুকু সৌজন্য দেখাতেই হয়। তাছাড়া উনি বাংলায় এসেছেন। বাংলার রীতি অনুযায়ী—রাখালকাকা গজরাতে গজরাতে বললেন, আমি চাই না বড়ো সাহেব তোমাকে অভদ্র বা মুডি ছোকরা ভাবেন। তারপরেই গোপন খবর ফাঁস করার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে

আরও বললেন, একটা কথা জানবে, অফিসের মধ্যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে মুখে অনেকেই আপত্তি করেন বটে কিন্তু মনে মনে ভীষণ খুশি হন। এই একটা জায়গায় সকলেই দুর্বল।

রাখালকাকার অনুমান একেবারে নির্ভুল। অমিতাভ ঘরে ঢুকে মিঃ নামবিয়ারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি মৃদু হেসে বললেন, অফিসে এসব ব্যাপার চলে না। তাছাড়া আজকাল তো এটা প্রায় উঠেই গেছে।

আপনি স্যার ঠিকই বলেছেন। রাখালকাকা সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থ হাসি হেসে বললেন, তবে অমিতাভদের ফ্যামিলি এখনও পুরনো মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে। ওর বাবাকে দেখেছি স্যার, মাত্র দু'বছরের বড়ো মানুষকেও উনি পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। বলতেন, যাঁর যা প্রাপ্য সম্মান তাঁকে তা দিতেই হবে। খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। উনি মারা যেতেই ওদের সংসারটা······রাখালকাকা খুব আবেগ নিয়ে বলতে লাগলেন, গত বছর এম. কম. পাশ করে অমিতাভ এখনও বেকার স্যার। ওর জন্যই আপনার কাছে অনুরোধ করেছিলাম। এখন আপনি স্যার ওকে একটা কিছু করে না দিলে—এই এক বছর ধরে তো কম চেষ্টা হলো না। যেখানেই গেছে, শুধু না আর না।

মিঃ নামবিয়ার খুব মন দিয়েই রাখালকাকার কথাগুলো শুনলেন। বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, ব্যাপারটা তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়—চাকরির এই সমস্যাটা গোটা ভারতবর্ষের। তুমি কি জানো ঠিক এই মুহূর্তে সারা দেশে ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি কোম্পানী বন্ধ হয়ে আছে। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা দু-কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় কারুরই কিছু একটা করার সুযোগ থাকে না।

স্যার, সেই আশাতেই তো আপনার কাছে আসা।

আমি কি তোমাকে কোনো কথা দিয়েছিলাম? মিঃ নামবিয়ার মনে করতে চেষ্টা করলেন।

রাখালকাকা সত্যি কথাটাই বললেন, আগের বারে যখন স্যার আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আপনি বলেছিলেন, 'পরের বার এসে দেখবো।'

মিঃ নামবিয়ারকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। অমিতাভর স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর কপালের ভাঁজ যে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি কোথায় যে ওকে ঢোকাবেন বুঝতে পারছেন না। ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা চিন্তা করে চলেছেন, কেননা অনেকক্ষণ ধরে উনি চুপচাপ রয়েছেন। হঠাৎ একসময় মিঃ নামবিয়ার অমিতাভকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোচিনে যাবে?

রাখালকাকা অমিতাভকে বলেছিলেন, সাহেবের এক কথায় কলকাতা অফিসেই তোর একটা গতি হয়ে যেতে পারে। সেই মতো অমিতাভর ধারণা ছিল চাকরি যদি হয় কলকাতাতেই হবে। এখন শুনতে হলো কোচিনে যেতে হবে। অমিতাভর প্রয়োজন একটা চাকরির। সেটা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে হোক না কেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। প্রশ্নটা হলো, কলকাতার একটা ছেলেকে কলকাতার অফিসে না রেখে কোচিনে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কতোখানি? অবশ্য এটা ঠিক, ওটা মিঃ নামবিয়ারের চিন্তার ব্যাপার। অমিতাভ পরিষ্কার উত্তর দিল, আপনি যেখানে পাঠাবেন আমি সেখানেই যাব।

চমৎকার! মিঃ নামবিয়ার উত্তর শুনে খুশি হলেন। কী যেন ভাবতে ভাবতে পরে বললেন, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে কোয়ার্টার দেওয়া যাবে না। তোমাকে হোটেলে থাকতে হবে। অবশ্য বিলটা কোম্পানীই দেবে। আরও একটা কথা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুমি আজকেই পেয়ে যাবে। দুটো দিন কলকাতা অফিসে রেখে আমরা তোমাকে কোচিনে ট্রান্সফার করবো।

মাত্র দুটো দিনের জন্য কলকাতা অফিস কেন? রাখলে তো পুরোপুরি রাখা যায়। এখানে দুদিন অফিস করার পর কোচিনে ট্রান্সফার। তাহলে প্রথম থেকেই বা কোচিনে নয় কেন? অনেকগুলো প্রশ্ন মনে এলেও অমিতাভ ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। না, কোনোরকম প্রশ্ন সে মিঃ নামবিয়ারকে করবে না। তবে স্পষ্টই

বোঝা যায়, ভেতরে নিশ্চয়ই অন্যরকম কোনো ব্যাপার রয়েছে। নয়তো তার মতো সামান্য জুনিয়ার ক্লার্ককে কোম্পানীর খরচায় হোটেলে রাখা হবে কেন? সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, দুদিন কলকাতায় অফিস করার পর কোচিন যাত্রার মধ্যে রহস্যজনক কিছু না থেকেই পারে না। অমিতাভ সব বুঝতে পারছে কিন্তু মিঃ নামবিয়ারের মুখের ওপর প্রশ্নের একটা মালাও ঝুলিয়ে দিল না। দেখাই যাক না কী হয়!

হোটেল বালসাম্মার পঁচিশ নম্বর ঘরে সারাটা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোলো অমিতাভ। না ঘুমিয়ে করবেই বা কী? একে তো এই দীর্ঘ জারনির ক্লান্তিতে ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক। তারপরে অফিস খোলা থাকলেও না হয় যাবার প্রশ্ন ছিল। আজ রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিন। সুতরাং ঘুমের আদর্শ দিন ছাড়া অমিতাভ অন্য কিছুই ভাবতে পারলো না।

ঘুম ভাঙলো সেই সন্ধ্যার পর। ঘুম ভাঙার পর মনে হলো এমন ঘুম সে বহুদিন ঘুমোয়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছুটির দিনের জনস্রোত দেখলো কিছুক্ষণ। একটা জিনিস স্বীকার করলো অমিতাভ, কেরলের মেয়েদের স্বাস্থ্য সত্যিই চমৎকার। প্রতিটা মেয়ের চেহারাতেই একটা বাঁধুনি রয়েছে। মনে হয় না কেউ কোনোরকম অসুখে ভুগছে। সারাক্ষণই হাসিখুশি। আর মাথার চুল তো একটা দেখবার জিনিস।

হাত-মুখ ধুয়ে কফি ইত্যাদি খেয়ে অমিতাভ প্যাণ্ট-শার্ট পরে নিল। নিচে নেমে একবার রাস্তার জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যাবে। আর কিছু না হোক, এক প্যাকেট সিগারেট তো কিনতে হবে। অমিতাভ এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত অলস পায়ে ঘুরে বেড়ালো। কোন দোকানে কোন জিনিসটা পাওয়া যায়—চোখ বুলিয়ে সেটাই শুধু একটু দেখে নেওয়া। পথ চলতে চলতে কান দুটোকে সজাগ রাখলো অমিতাভ। মালয়লম ভাষার বন্যায় সে যে কোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে। এক বর্ণ বুঝতে পারছে না। একটা স্টেশনারী

দোকানের সামনে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বছর দশেকের একটা ভিখিরি জাতীয় ছেলে অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করতে ভদ্রলোক মুখ খুললেন, 'শব্দম উন্ডাক্কা ইরিকিয়া। নিঙ্গেল পোগু।' কথাটার মানে কী? অমিতাভ কলকাতার প্রচলিত ফরমুলায় বাংলা মানেটা করলো এইরকম: হবে না, ভাগ। এখন থেকেই ভিক্ষে করছিস—কাজ করবি আমাদের বাড়িতে? সে বেলায় না।

আরও কিছুটা এগিয়ে গেল অমিতাভ। দারুণ ঝকঝকে আর একটা বড়ো স্টেশনারী দোকান। শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত। স্বভাবতই বেশ ভিড় সেখানে। অমিতাভর হঠাৎ নজরে পড়লো ঐ ভিড়ের একপাশে মোনালিসা দাঁড়িয়ে। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে নীচু সুরে কী যেন বলাবলি করছে। ভদ্রমহিলা শুধু মাঝেমাঝে মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানিয়ে চলেছেন। মোনালিসার মুখের গড়নের সঙ্গে ওঁর বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। উনি ওর মাও হতে পারেন। ভদ্রমহিলার বয়স ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ হবে। একটু ভারীর দিকে চেহারা। সিঁথিতে সিঁদুর ছড়ানো। কপালেও একটা সিঁদুরের টিপ। হাতে শাখাও রয়েছে। অমিতাভর মনে হলো একেবারে বাঙালী চেহারা। সে কিন্তু আর একটা কথা ভেবেও খুশি হলো। কেনাকাটা করতে যখন বেরিয়েছে মোনালিসা নিশ্চয়ই খুব একটা দূরে থাকে না। কাছাকাছি কোথাও হবে, সেই কারণে মাকেও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। ভাবটা এই, চলো একটু ঘুরে আসি। অমিতাভর একবার ইচ্ছা হলো, কেনাকাটা করতে ঐ দোকানের মধ্যে ঢুকলে কেমন হয়? খুবই ছেলেমানুষি ইচ্ছা। কিন্তু ঐ মোনালিসার কাছে ওসব ইচ্ছা-টিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। সে খুব বাজে ধারণা করবে। আর অমিতাভ হয়ে উঠবে এক অতি সাধারণ এবং সহজ ছেলে। তেমনটা ভাবতে দিয়ে নিজেকে অতো ছোট করতে পারবে না। ব্যাপারটা যদি আচমকা ঘটতো সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু পরিস্থিতিকে তৈরি করে এইভাবে কাজে লাগানোকে অবশ্যই সাজানো সাজানো মনে হয়। অমিতাভ ঠিক করলো কিছুতেই সে দোকানের

মধ্যে গিয়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। কেন করবে? অতো বাড়াবাড়ি রকমের নিস্পৃহতা যার তারই সামনে গিয়ে পরিচিতের মতো হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়াবে? অমিতাভ জায়গাটা থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। নয়তো বেরুবার মুখে মেয়েটা ভাবতে পারে সে ওর পিছু নিয়েছে। মোনালিসাকে এতোটা সুখী এবং গর্বিত হতে দিতে অমিতাভ রাজী নয়। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলো, চাকরি পাচ্ছিলো না ঠিক কথা— কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোচিনে এই এতো দূরে তাকে আসতে হবে তা কি কখনো ভেবেছিল? হাজার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও এই ব্যপারটা ছিল না। অথচ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর জমজমাট আড্ডা ছেড়ে সে এই মুহূর্তে কোচিনের ত্রিপুনীথুরার চৌরাস্তার মোড়ে। একা একা গভীরভাবে ভাবলে একটু অবাকই লাগে। বিস্ময়ের ঘোরটা কিছুতেই যেতে চায় না। অমিতাভর হঠাৎ নজরে পড়লো মোনালিসা তার মাকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ডান দিকের পথটা ধরে যাচ্ছে। মোনালিসার হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। অমিতাভ স্পষ্ট লক্ষ্য করলো প্রায় উপচে পড়া কেনাকাটার সামগ্রী থেকে কী যেন একটা ছোট্ট প্যাকেট রাস্তায় পড়ে গেল। না মোনালিসা, না মোনালিসার মা কেউই খেয়াল করলেন না। যেমন হাঁটছিলেন তেমনই এগিয়ে চললেন। অমিতাভর খারাপ লাগছিল। শখের জিনিস হয়তো ওটা। বাড়ি গিয়ে তো খুঁজেও পাবে না। তবু সে আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা রইলো। প্যাকেটটা কুড়িয়ে মোনালিসার হাতে তুলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু সে মনে মনে ভীষণভাবে চাইছিলো কেউ একজন ওটা কুড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিক। আকাঙ্ক্ষার কথা কি অপরে শুনতে পায়? হয়তো তাই। একটা লোক ওটা কুড়িয়ে মোনালিসার হাতে দিতেই অমিতাভর যেন জ্বর ছাড়লো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে অমিতাভ শুয়ে পড়লো বটে কিন্তু ঘুম যেন আসতে চায় না। আসলে দুপুরে যা একখানা ঘুম দিয়েছে তার জের এখন টানতেই হবে। রাতের খাওয়াটাও একটু

ভারি হয়েছে। ডাল, ভাত, সবজি, দুরকমের মাছ। পমফ্রেট আর চেম্মিন অর্থাৎ চিংড়ি। এতো বড়ো বড়ো চিংড়িমাছ অমিতাভ তার জীবনে কখনও খায়নি। কলকাতায় এর অর্ধেক সাইজের মাথা ছাড়া যেটা পাওরা যায় তার দামও সত্তর থেকে আশি টাকা কেজি। গত বছর ভাইফোঁটার দিনে খেয়েছিল।

চিংড়িমাছের কারিটা অমিতাভ খেয়েছে বটে কিন্তু কী কষ্টে যে খেয়েছে তা শুধু সে-ই জানে। এখানকার সব রান্নাই নারকেল তেল দিয়ে। সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হয়নি। নারকেল তেলের রান্না বরং ভালোই লেগেছে। অমিতাভর কষ্টটা অন্য কারণে। তার বড়দা সুমন এবং মেজদা রজত চিংড়িমাছটা দারুণ ভালোবাসে। যার ফলে প্রতি বছর ভাইফোঁটায় ছোড়দি মাংস টাংস না করে চিংড়িমাছের মালাইকারি করবেই। মাংস যদি করেও তাহলেও চিংড়িমাছের একটা আইটেম থাকবেই। সেই বড়দা আর মেজদাকে ছেড়ে একা একা এই মহামূল্যের মাছ খেতে কষ্ট না হয়ে পারে? বাড়ির সবাইকে ছেড়ে কেমন যেন এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করার ফলে অমিতাভ যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল। হোটেলের মালায়লমী ছোকরা গঙ্গাধরম ইংরেজী এবং হিন্দি মিশিয়ে বলেছিল স্যার আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না। নিশ্চয়ই বাড়ির কথা ভাবছেন? চমকে গঙ্গাধরমের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অমিতাভ। কতো আর ওর বয়স হবে? বড়োজোর কুড়ি। অথচ চমৎকার সাইকোলজি বোঝে তো! অমিতাভ হেসে উত্তর দিয়েছিল, তা একটু ভাবছি।

যখনকার যা কাজ স্যার। গঙ্গাধরমের পরিষ্কার কথা, এখন খাবার সময়। মন খারাপ করবেন না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমিতাভ এখন সেই মন খারাপই করে চলেছে। আসলে রাতের নির্জনতায় বাড়ির আপন মানুষগুলো যেন অনেক কাছে চলে আসে। সারাদিনের কোলাহল আর ব্যস্ততার শেষে তাদের কথাই মনকে বড়ো বেশি উতলা করে তোলে। ঘুম আসবে কী, দুপুরে না ঘুমালেও অমিতাভ এই মুহূর্তে আরামে ঘুমাতে পারতো না। মনও ঠিক এক জায়গায় বসে নেই।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ভাইঝি টুলটুলি আর ভাইপো বাপ্পার কথাও ভাবলো। বড়ো বৌদি দীপ্তি এবং মেজ বৌদি কমলার স্নেহমাখা ভালবাসার অ্যালবাম সাজাতে সাজাতে বড়দা মেজদাও এক ফাঁকে চলে এসেছে। ছোড়দি, জামাইবাবু আর ভাগ্নে রতনের ছবিটাও চোখের ওপর পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। সকলের কথা ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে বুঝি ঘুম আসছে এবার। সামনে কোথায় যেন গীর্জা রয়েছে। সেখানকার বড়ো ঘড়িটা শব্দ তুলে সময়কে চিহ্নিত করে চলেছে আপন গতিতে। বাড়ির পর বন্ধুদের কথা মনে করতেই চিন্তাগুলো ক্রমশ এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে আসার সময় সঞ্জীবের সংগে দেখাই হলো না। রাতুলের সংগে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল শুক্রবার দিন। অথচ বৃহস্পতিবারই তাকে রওনা দিতে হলো। রাতুল হয়তো টিকিট কেটে দাঁড়িয়েই ছিল। ক্লাবে শুধু শুধু সেদিন নিখিলের সংগে কথা কাটাকাটি হলো। ওর ঐ এক দোষ। ক্যারামবোর্ড থেকে কিছুতেই ওকে সরানো যাবে না। অথচ বহু প্লেয়ার তখন অপেক্ষা করছে। ও সেটা বুঝতেই চায় না। অনেকদিন হজম করার পর অমিতাভ সেদিন বলেছিল, তুই এক কাজ কর, ক্যারাম-বোর্ডটা বাড়ি নিয়ে যা। কেউ তোকে বিরক্ত করবে না। ব্যস! তারপরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল চিৎকার চেঁচামেচি। নিখিলের একটাই প্রশ্ন, তুই আমাকে ওকথা বলার কে? ও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নিখিলকে প্রায় সামলানোই যাচ্ছিলো না। কে কে যেন ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। দিব্যেন্দু, অপু, শংকর ·· অমিতাভ আর মনে করতে পারছে না। ও এখন পুরোপুরি ঘুমের সমুদ্রে ডুব দিয়েছে।

পরদিন সকাল আটটায় যখন অমিতাভ হোটেল থেকে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন একটা কাণ্ডই হলো। হোটেলের সেই ছোকরা ছেলেটা অর্থাৎ গংগাধরম হাসতে হাসতে হাতে একটা নারকেল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। কোনোরকম কথাবার্তা না বলে প্রথমেই সে ঘরের চৌকাঠের ওপর সেটা ভেঙে অমিতাভর মুখের দিকে তাকালো। আচমকা এই ব্যাপারটায় অবাক হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো এটা?

স্যার, আপনার চাকরির আজ প্রথম দিন। নারকেল ভাঙাটা খুব শুভ ব্যাপার। সেই কারণেই—

তুমি মানো এসব? অমিতাভ হাসতে লাগলো।

মানা না মানার থেকেও বড়ো জিনিস হলো এটা একটা রেওয়াজ। কেন স্যার? আপনি বুঝি মানেন না? গঙ্গাধরমের উৎসাহটা প্রায় নিভেই গেল। ভালো করতে গিয়ে ব্যাপারটা বোধহয় উল্টো হলো। স্যার অসন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই। সেই-জন্যই ঐ জিজ্ঞাসা। গঙ্গাধরম লজ্জিত সুরে আবার বললো, আপনি রাগ করলেন স্যার?

রাগের প্রশ্নই নেই। অমিতাভ শুধু ভাবছিল একটা দিনের আলাপ এই গঙ্গাধরমের সঙ্গে। গতকাল সন্ধ্যার পর এবং রাতের খাওয়ার শেষে ঐ ছেলেটির হাতে বেশ কিছুটা অলস সময় থাকার ফলে অমিতাভ সবাইকে ছেড়ে কেন জানি না ওর সঙ্গেই অনেক কথা বলেছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গাধরম তার বাড়ির সবার কথা অমিতাভকে শুনিয়ে দিয়েছে। যেমন সে বি-এ পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষার মাস চারেক আগে বাবা মারা যান। ওরা তিন ভাই দু বোন। ভাইবোনদের মধ্যে ও হচ্ছে তৃতীয়। বাড়িতে অ রও মানুষ আছে। ওর দুই কাকা এবং দুই কাকিমা। এক কাকার তিনটেই মেয়ে। অপর কাকার এক ছেলে এক মেয়ে। সবাই একসঙ্গে রয়েছে। আলাদা হবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। গঙ্গাধরমের মাকে সবাই ভগবানের চেয়েও বেশি মানে। উত্তরে অমিতাভও নিজের কথা বলেছিল কিছু কিছু। তার কোচিনে আসার কারণটা তো প্রথমেই জানানো হয়েছিল। গঙ্গাধরম নারকেল ভাঙলো তো সেইজন্যই। অমিতাভ সেটাই ভাবছিল। কতো সহজে ও আপন করে নিতে পারলো। তার শুভকামনা গঙ্গাধরম যেটুকু করলো সেটাই তো যথেষ্ট। অমিতাভ ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, আমি কেন রাগ করবো—তুমি তো কোনো অন্যায়ই করলে না। বরং যা করলে বাড়ির প্রিয় মানুষগুলোও এটাই করে।

ত্রিপুনীথুরা থেকে কেরালা স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে উঠে

বসলো অমিতাভ। সে যাবে আম্বালামেডু। ওখানে রমন ফার্টিলাইজারের অফিস—ফ্যাক্টরি। পাশেই ওদের কোম্পানীর হেড অফিস। টিকিট কাটার সময় অমিতাভ কনডাকটরকে বারবার বলে রাখলো, সে এখানে নতুন। কিছুই চেনে না। তাকে যেন আম্বালামেডুতে নামিয়ে দেওয়া হয়। কনডাকটর তাকে আশ্বাস দিতেই সে বাসের জানলা দিয়ে চোখ দুটিকে বাইরে মেলে দিল। রাস্তার দুপাশে পাকাবাড়ির সঙ্গে মাথায় খোলার চাল নিয়ে অজস্র মাটির বাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটির দেওয়ালগুলো কী চমৎকার মসৃণ! যেন এইমাত্র কেউ লেপে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা জমি। বিরাট বিরাট পুকুর। পুকুরের চারপাশে এবং প্রতিটি বাড়ির আশেপাশে এলোপাথাড়ি নারকেল গাছ। বেশ কিছু দূর এগোবার পর দুপাশে শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। মাঠগুলো যেন সবুজ রঙের বেনারসী পরে নতুন বৌয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে মাথা দুলিয়ে চলেছে। দূরে ফাঁকা ফাঁকা বাড়িগুলো নারকেল গাছের ছাতা মাথায় দিয়ে নিজেদের যেন লুকিয়ে রেখেছে। মাঝারি হাইটের একটা টিলায় বাঁক নিয়ে বাসটা বেশ কিছুটা নিচের দিকে নামতে লাগলো। পথের দুপাশে আবার জমজমাট ঘর বাড়ি, দোকান-পসার। লোকজনের ভিড়ে এলাকাটা যেন সবসময়েই চঞ্চল হয়ে রয়েছে। কনডাকটর চিৎকার করে উঠলো, আম্বালামেডু রমন ফার্টিলাইজার স্টপেজ।

বাস থেকে নেমে অমিতাভ চারপাশের ওপর একবার চোখ দুটোকে বুলিয়ে নিল। যে ফুটপাথে নেমেছে সেখান থেকেই পীচ-ঢালা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। আর একটা রাস্তা বাঁ দিক দিয়ে রমন ফার্টিলাইজারের দিকে চলে গেছে। পথের দুপাশে ইউক্যালিপটাসের সাজানো বনরাজি। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর ডান দিকে একটা ড্যাম। রাস্তাটা আবার বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে। বাস সেইদিকে ঘুরতেই রমন ফার্টিলাইজারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটা চোখে পড়ল অমিতাভর। এই বিল্ডিংটার পরেই ওদের কোম্পানীর ফ্যাক্টরির বাউন্ডারি শুরু।

অমিতাভ তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর তিনতলার

প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চিফ পার্সোনাল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণকে স্লিপ পাঠিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে তিনি ডাকতে পারেন। মনের মধ্যে চাপা উদ্বেগ নিয়ে অমিতাভ বাইরেটা দেখছিল। বিল্ডিংটার ফ্লোরগুলো খুব উঁচু উঁচু। এই তিন-তলাটাই যেমন সাধারণ পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু। এখান থেকে কোচিন শহরটাকে মনে হচ্ছে নারকেল গাছে ঘেরা একটা দ্বীপ। এখানকার ঘরবাড়ি, আকাশ সবকিছু ঢাকা পড়েছে ঐ দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের ছায়ায়। নদী-নালা-খাল-বিলও কম নয়। জল আর গাছ যেন কোচিনের প্রাণ। সবুজের স্নিগ্ধতায় চোখ দুটো যখন জুড়িয়ে যাচ্ছে, বেয়ারা এসে অমিতাভকে খবর দিল, সাহেব ডাকছেন আপনাকে।

মিঃ রামাকৃষ্ণাণ কাগজপত্র যা দেখার দেখে এবং অমিতাভর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে বিভাগীয় প্রধানকে ডেকে বললেন, ইনি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়ার ক্লার্ক। কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছেন। একে যেখানে দেবেন তার ব্যবস্থা করুন।

বিভাগীয় প্রধান ভদ্রলোকটির সঙ্গে অমিতাভ দোতলার একটা প্রশস্ত ঘরে ঢুকতেই উনি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে ইংরেজীতে যা বললেন তা হলো এই—আপনি এখানে বসুন। কাজকর্ম পেতে পেতে দু-চার দিন লাগবে। তবে আপনি এই এস্টাবলিস্ট-সেকশনে এসেই বসবেন। তারপরেই ভদ্রলোক আরও ফিসফিস করে অমিতাভর প্রায় কানে কানেই বললেন, প্রথম কয়েকটা দিন একটু চুপচাপ থাকবেন। মানে কারো সঙ্গে খুব একটা কথা টথা বলবেন না। পরে দেখবেন সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের তড়িৎগতিতে চলে যাওয়ার পর অমিতাভর কেমন যেন সন্দেহ জাগলো। ব্যাপারটা কী? বিভাগীয় প্রধান ভদ্রলোকটির নাম সে জানে না। এই মুহূর্তে তার কোনো দরকারও নেই। কিন্তু উনি যা বলে গেলেন সেটা অমিতাভর কাছে খুবই সাঙ্ঘাতিক বলে মনে হলো। 'চুপচাপ থাকবেন। কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে'—এসবের মানেটা কী?

এস্টাবলিস্টমেণ্ট সেকশনের এই প্রশস্ত ঘরে জনা তিরিশের মতো লোক যার যার টেবিলে বসে কাজ করছিল। বিভাগীয় প্রধান ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরেই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে অমিতাভকে ঘিরে ধরলো। ওদের চোখে-মুখে যথেষ্ট উত্তেজনার ছাপ। তারা প্রায় সবাই মালয়লম ভাষায় অমিতাভকে অনর্গল প্রশ্ন করতে লাগলো। দু-একজনের হাতের মুঠিও পাকানো।

এমন একটা ব্যাপারের জন্য অমিতাভ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তার চাকরি পাওয়ার মধ্যে ভেতরে ভেতরে যে একটা অন্য স্রোত বইছিল সেটা সে কলকাতা বসেই টের পেয়েছে। তবে পুরো ছবিটা তার কাছে পরিষ্কার না থাকার দরুন মোটামুটি অনুমান করেছিল সে বুঝি কোনো দ্বন্দ্বের শিকার হতে চলেছে। ঘটনাটাও সেদিকেই গড়াচ্ছে। কিন্তু শেষ দেখা না দেখে অমিতাভ এতো সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। তাহলে তো প্রথম থেকেই সে কোচিনে আসতে আপত্তি করতো। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা যে কোনো পরিস্থিতিতেই মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলতে পারে। অমিতাভ ওদের মালয়লম ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পারলেও ওরা যে তার ওপরে চড়াও হয়েছে—এটা বুঝতে অসুবিধার কোনো কারণ নেই। অমিতাভ এক পলকে ওদের মুখগুলো দেখে নিয়ে খুব শান্ত গলায় বললো, আমি দুঃখিত, আপনাদের ভাষাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এরপর মিনিট দুয়েক যেন বরফের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। এতোগুলো মানুষের কারো মুখেই কোনো কথা নেই। সকলেই যেন একই সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে। স্বাভাবিকতা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তখন ইংরেজীতে, কেউ কেউ হিন্দিতেও প্রশ্নের বর্ষণ শুরু করে দিল।

আপনি তাহলে এখানে এসেছেন কেন? প্রশ্নকর্তাকে দেখে নিয়ে অমিতাভ আগাগোড়া মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে উত্তর দিল, যে কারণে আপনিও এসেছেন।

এটা আমার দেশ।

আমার তাহলে কোনটা? অমিতাভই উল্টে প্রশ্ন রাখলো।

সেটা ম্যানেজমেণ্টকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আর একজন চিৎকার করে উঠলো, আপনাকে আমরা চাকরি করতে দেব না। আপনার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অবৈধ। আপনি উঠে পড়ুন। দু-চারজন অমিতাভকে চেয়ার থেকে ওঠাবার চেষ্টা করতেই কেউ হয়তো এই ফাঁকে ওকে একটু ধাক্কাও দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ফুঁসলে উঠলো, আমি চোর নই! আমার গায়ে কেউ হাত তুলবেন না। আমি তো আপনাদের সঙ্গে ···অমিতাভ থেমে পড়লো। ঐ সময়ে ঘরের মধ্যে যে উপস্থিত হলো তাকে হাজার রকম কল্পনার মধ্যেও অমিতাভ কখনো ভাবতে পারেনি। সত্যিই জলে যেন শিলা ভাসছে। খুবই গাম্ভীর্য নিয়ে মোনালিসা তখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উপস্থিত জনতা তখন মালায়লম ভাষায় কী যে ওকে বোঝাচ্ছে ওরাই জানে। মোনালিসা শুধু মাথাটা মৃদুভাবে নাড়িয়ে যাচ্ছে।

মিনিট দশেক ধৈর্য ধরে শোনার পর মোনালিসা ওদের কী যেন একটা নির্দেশ দিল। তারপর অমিতাভকে একপলক দেখে নিয়ে বললো, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। চারপাশে ততোক্ষণে আরও ভিড় জমে গেছে। মোনালিসার কথা শুনে প্রত্যেকেই জয়ধ্বনি দেবার ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলো, তান্নে তিরু তান্নে তিরু আওয়ার ডিম্যাণ্ড তান্নে তিরু।

অমিতাভর কাছে মোনালিসার ভূমিকাটা তখনও পরিষ্কার নয়। সে কে, কী কারণে ওর সঙ্গে যেতে বলছে এবং যাবেটাই বা কোথায়—এই ব্যাপারগুলো একটাও স্বচ্ছ নয়। তাছাড়া সবাই অমন জয়ধ্বনিই বা দিল কেন? ঐ কথাটারই বা মানে কী—তান্নে তিরু তান্নে তিরু আওয়ার ডিম্যাণ্ড তান্নে তিরু? কোনো কিছু না বুঝে হুট করে মোনালিসার সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে যাওয়াটা কী ঠিক? মাথামুণ্ডু কিছুই তো জানা যাচ্ছে না। চারদিকেই যেন অন্ধকারের জমাট দেওয়াল। অমিতাভ মোনালিসার মুখের দিকে তাকালো। খুব সংযত হয়ে স্বাভাবিক গলায় বললো, আমি তো আপনাকে চিনি না।

শোনো ওর কথা! বিক্ষোভে ফেটে পড়লো জনতার ঢেউ।

ছেলেটার স্পর্ধা দেখো—পদ্মিনী ঊষাকে বলছে কিনা চিনি না।

ওকে একটু চিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাক।

ব্যাটা ম্যানেজমেণ্টের দালাল। এখানে এসেছো আমাদের লড়াই ভাঙতে—আবার বলছো পদ্মিনী ঊষাকে চিনি না। তোমার এই বলাটাই প্রমাণ করছে তুমি ওকে বেশ ভালোভাবেই চেনো।

ওর সঙ্গে এতো কথা বলার কী আছে? যে আন্দোলন ভাঙতে এসেছে তার হাত দুটোও ভেঙে দাও।

সত্যিই ওকে অনেক বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে। এতো ভালো ব্যবহার করার যোগ্য ও নয়। ওকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর বাইরে বার করে দাও।

ছেলেটা নিশ্চয় সবকিছু জেনেশুনেই এসেছে। অতো দূরে থেকে এখানে এসে যে এতো গর্জন করতে পারে, সমুদ্র তাকে খুবই ভালোবাসে। ওকে আরব সাগরে ছুঁড়ে দাও।

এখানে করণীয় কিছু নেই। পুরো এলাকাটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। অমিতাভ নির্লিপ্তভাবে ওদের মন্তব্যগুলো শুনে যাচ্ছিলো। এতো মানুষের চিৎকার, চেঁচামেচি এবং উত্তেজনার মধ্যে তার কথা কেউ শুনবে না। সেই মানবিকতা এই মুহূর্তে কারো নেই। সুতরাং বোঝাতে যাবার চেষ্টা করা বৃথা। বরং ওরা ভাবতে পারে সে তার দোষ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। এতে ফল আরও খারাপ হতে পারে। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো। কিন্তু ক্ষিপ্ত মুখগুলোকে দেখতে দেখতে অমিতাভ ক্রমশ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। এরা যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা করে বসতে পারে। করুক। তাকে মেরে ফেলে দিক ওরা। অমিতাভ জ্ঞানত কোনো অন্যায় করেনি। সে কেন মাথা নিচু করবে? নতুন করে সে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করলো।

সব জায়গাতেই কিছু কিছু অতিবিপ্লবী থাকে। কাউকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। বেঁধে আনতে বললে মেরে আনে। এদের বুদ্ধি যতো না কাজ করে, অহেতুক আস্ফালনের দাপটটা তার চেয়েও বেশি দেখাতে চেষ্টা করে। গণ্ডগোলগুলো

একটা পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে দ্রুত মোড় নিয়ে জটিল আকার ধারণ করে এইসব কারণেই।

হঠাৎ দুটি ছেলে ক্ষিপ্ত বাঘের মতো অমিতাভর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পদ্মিনী বুঝতেই পারেনি এমন একটা ব্যাপার হতে পারে। উত্তেজিত মানুষগুলোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু হঠাৎ ওরা এটা কী করে বসলো? একটি মাত্র ছেলেকে হাতের কাছে পেয়ে বিশাল জনতা যা খুশি করবে এটা ঠিক নয়। পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে পদ্মিনী তার ভরাট গলায় বেশ জোরেই বলে উঠলো, ওকে ছেড়ে দিন। এসব আপনারা কী শুরু করলেন?

যারা অমিতাভর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা খুব নিরুৎসাহ হয়ে সরে দাঁড়ালো। পুরো চত্বরটা তখন আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। অমিতাভর খুব যে একটা লেগেছে তা নয় তবে সে বেশ মুষড়ে পড়েছে। এইভাবে তার গায়ে কেউ হাত তুলবে—অনেক রকমের সম্ভাবনার মধ্যেও এই ছবিটা সে কোনোদিনও আঁকেনি। মোনালিসা, না—না, মোনালিসা নয়—ওর নাম তো জানাই গেছে। পদ্মিনী ঊষা। সেই পদ্মিনী এবারে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম ভাষা এবং সুরে বলতে লাগলো: আপনারা এইমাত্র যা করলেন তা আমাদের সবাইকে লজ্জা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যে অসংযমী আচরণ এবং শৃঙ্খলা হারালেন এর চেয়ে আর কী আমরা হারাতে পারি? আমি জানি আমাদের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে কিন্তু সেই বিক্ষোভটা কি একজন নিরপরাধ মানুষের ওপর ফলাতে হবে? এই বিক্ষোভকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগাতে হবে—সেটা নিশ্চয়ই চাকরি করতে আসা একটি ছেলের চেয়ারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। আমাদের লড়াইটা ওঁর সঙ্গে নয়। আমরা বোঝাপড়া করবো ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে। আমাদের সমস্ত মানুষের বিপক্ষে গিয়ে ম্যানেজমেণ্ট কতোটা শক্তি ধরে আমরা যাচাই করবো সেটা—কিন্তু আমাদেরই মতো সাধারণ একজনের সঙ্গে শক্তি ক্ষয় করাটা ম্যানেজমেণ্টকে নিশ্চয়ই হাসাবার

সুযোগ করে দেবে। আমি জানি এইরকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু পারেন না। এটা খারাপ। তাহলে আমরা নিজেদেরকে চেতনাসম্পন্ন মানুষ বলে মনে করি কেন? আপনারা সবাই ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা করে দেখুন তো—যেভাবে আমরা ওর ওপর চড়াও হয়েছিলাম তাতে যে কোনো মুহূর্তে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতে পারতো। আর তাতে লাভ হতো কার? ম্যানেজমেণ্ট এই ঘটনার ওপর নতুন রং চড়িয়ে সে তার কাজ গুছিয়ে নিত এবং আমাদের মাথার ওপরে পাঁচ মণের একটা বোঝা চাপিয়ে দিত—যাতে আমরা আর কখনো মাথা সোজা করে না দাঁড়াতে পারি। এই ভুলগুলো যতো করবো কর্তৃপক্ষও ঠিক ততোখানি সুন্দর করে হাততালি বাজাবে। আপনারা যদি ম্যানেজমেণ্টের এই চালাকি-গুলো ধরতে না পারেন তাহলে সেটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। কেরালায় আমাদের এই ইউনিটে কী আন্দোলন হচ্ছে না হচ্ছে কলকাতা থেকে আসা এই ভদ্রলোকের জানার কথা নয়। ম্যানেজ-মেণ্ট শয়তানিটা কোথায় কোথায় করেছে সেটা আগে আমাদের দেখা দরকার। আর আন্দোলন তো আমাদের হাতিয়ার। ম্যানেজ-মেণ্টের সঙ্গে আমাদের রণকৌশল কী হবে—তা আমরা এক্সিকিউটিভ মিটিং ডেকে ঠিক করবো। আর একটা কথা আমরা প্রায়ই বলি, আমরা অন্যায় করি না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করি না। কিন্তু একটু আগে যেটা হলো সেটা তাহলে কী? এটা আপনারা স্বীকার করছেন কী আমাদের অন্যায় হয়েছে? গুণ্ডাগর্দি যদি কারো করতে ইচ্ছ হয় তার জায়গা আলাদা। সঠিক আন্দোলনকে হঠকারিতা করে কেউ এভাবে পেছন থেকে টেনে ধরবেন না। এতে ক্ষতি আমাদেরই। আশা করি আপনারা এর গুরুত্ব অনুভব করে শৃংখলা বজায় রেখে চলবেন। আমরা এখন ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবো। ওঁর কাছ থেকে যেটুকু জানার জেনে নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম তৈরি করবো। আপনারা এখন যে যাঁর কাজে চলে যেতে পারেন। কেরালার মানুষ সম্পর্কে বাইরের কেউ বাজে ধারণা নিক—এটা আমি চাই না।

মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। সকলের ওপর যে পদ্মিনীর প্রচণ্ড কর্তৃত্ব এবং দাপট সেটা ওর ভাষণ শুনতে শুনতেই অমিতাভর বারবার মনে হয়েছে। তার কথা সে নিজে যেটা বলতে পারেনি—পদ্মিনী সেই দিকটাও কভার করেছে। কী চমৎকার ভাষা এবং বুদ্ধির খেলায় সে উত্তেজিত জনতাকে বাধ্য ছেলের মতো কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দিল। অমিতাভ এজন্য হাজার বার ওর তারিফ করবে। যেটা সত্যি সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। কিন্তু ওর পরিচয়টা কী? যে মেয়েকে ট্রেনের সারাটা পথে নিতান্তই শান্ত এক বই-পড়ুয়া বলে মনে হয়েছিল, সে যে প্রয়োজনে আগ্নেয়গিরি হতে পারে—সেটা তো অমিতাভ নিজের চোখেই দেখলো।

ভিড়টা ফাঁকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনী অমিতাভর মুখের দিকে এক-ঝলক তাকালো। খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার কোথাও লাগেনি তো?

তেমন কিছু নয়। কনুইটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে।

আমার নাম পদ্মিনী উষা। সারা ভারত রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানীর এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। এঁরাও প্রত্যেকেই এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার। ওখানে যে নয়জন বিভিন্ন বয়সের লোক দাঁড়িয়েছিলেন—পদ্মিনী নিজের এবং ওঁদের পরিচয় দিয়ে আরও বললো, আশা করি আপনি ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

অমিতাভ একটি মাত্র কথা খরচ করলো, চলুন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ওরা ডান দিকের চওড়া রাস্তাটা ধরে মিনিট সাতেক হাঁটার পর সামনেই একটা মাঝারি একতলা বাড়ি চোখে পড়লো। বাড়ির গায়ে বড়ো একটা সাইনবোর্ড। মালয়লম এবং ইংরেজীতে লেখা রয়েছে কোম্পানীজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। চমৎকার ফুলের বাগান পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দেখা গেল বেশ বড়ো একটা হলঘর। পুরো ঘরটা জুড়ে ফরাস পাতা। একপাশে গোটা চারেক স্টীলের আলমারি। কুশন

দেওয়া একটা চেয়ার। চেয়ারের সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপর বেশ কিছু কাগজপত্রের ফাইল, পেপার ওয়েট, কলমদানি এবং ফোন। টেবিলের এপাশেও গোটা কুড়ি চেয়ার এবং কয়েকটা ঝকঝকে বেঞ্চ। দেওয়ালে লেনিনের ফুল সাইজের একটা ছবি।

অমিতাভকে বসতে বলে পদ্মিনী টেবিলের ওপাশে গিয়ে কুশন দেওয়া চেয়ারটাতে বসতে না বসতেই গোটা তিনেক ফোন করলো প্রায় ঝড়ের গতিতে। যাদের যাদের ফোন করলো—মনে হলো যেন জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিল। মিনিট পাঁচেক সময় গড়াতে না গড়াতেই দফায় দফায় সব মিলিয়ে আরও একুশ জন এলেন। একজন এসে পদ্মিনীর হাতে টাইপ করা দুটো পৃষ্ঠা দিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল ঠিক তেমনিভাবেই বেরিয়ে গেল। টাইপ করা পৃষ্ঠার ওপর পদ্মিনী যখন চোখ বোলাচ্ছিল তখন ঘরে ঢুকলেন একজন ডাক্তার। ওঁর গলায় একটা স্টেথিস্কোপ মালার মতো ঝুলছিল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে পদ্মিনীর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার পদ্মিনীজী?

অমিতাভকে দেখিয়ে পদ্মিনী বললো, ওঁর হাতটা ব্যথা-ব্যথা করছে। ওঁকে একটু দেখুন তো—

কোন হাতটা?

ছোট্ট এই ব্যাপারটার মধ্যেও পদ্মিনীর সজাগ দৃষ্টি এবং আন্তরিকতার কথা ভাবতে ভাবতে অমিতাভও উত্তর দিল, ডান হাতটা। ব্যথাটা কনুইয়ের কাছেই।

ডাক্তার অমিতাভর কনুইটা ভালো করে দেখে টেখে নিয়ে একটু টেপাটেপিও করলেন। কী, লাগছে? তারপর নিজেই আবার বললেন, কিচ্ছু হয়নি। জায়গাটা একটু ফুলে গেছে এই যা—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুটো অ্যাণ্টাসিড আর একটা পেনকিলার খেয়ে নেবেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পদ্মিনী সকলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, আমরা একত্রিশ জন এখানে উপস্থিত আছি। বাকি দুজন কমিটি মেম্বার ছুটিতে। তো আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। পদ্মিনী সেই টাইপ-করা কাগজটার ওপর আর

একবার চোখ বোলাতে বোলাতে অমিতাভকে পরিষ্কার একটা কথা জানিয়ে দিল, আমাদের প্রয়োজনে আমরা আপনাকে হয়তো অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারি। উত্তর দেওয়া না দেওয়াটা আপনার ওপর। তবে নিশ্চয়ই আপনি কোনোরকম বিতর্কে যাবেন না বলেই আশা করি। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাকে সহজ করবার জন্যই আমাদের এই আলোচনা। সেদিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু না বললেই নয় সেটা অন্তত বলবেন। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে পদ্মিনী নরম গলায় বললো, আমরা জেনে গেছি আপনার নাম অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি এম, কম, পাশ করেছেন। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা যদি খোলাখুলি এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের সামনে বলেন তবে আমরা আলোচনায় ভালোভাবে অংশ নিতে পারবো।

দেখুন, এই কোম্পানীর কলকাতা অফিসে আমার এক কাকা কাজ করেন।

কী নাম? পদ্মিনীর ছোট্ট প্রশ্ন।

রাখাল ভট্টাচার্য। সিনিয়ার ক্লার্ক। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনী যে ছেলেটি কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল তাকে নির্দেশ দিল নামটা লিখে নাও। হ্যাঁ, তারপর বলুন—

এম. কম. পাশ করার পরেও একটা বছর ধরে বেকার ছিলাম। কোথাও কিছু জুটছিল না। রাখালকাকাকেও বলা ছিল। উনি নামবিয়ার সাহেবকে দেড় মাস আগে একবার আমার কথা বলেছিলেন। মিঃ নামবিয়ার তখন বলেছিলেন পরের বার এসে দেখবেন। এবারে কলকাতা অফিসে নামবিয়ার সাহেব আসতে রাখালকাকা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং যথারীতি একটা চাকরি দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। একটু সময় নিয়ে অমিতাভ ফের বলতে লাগলো, মিঃ নামবিয়ার প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কোচিনে যেতে আমি রাজী কিনা? তখনই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। এতো বড়ো কলকাতা অফিসে আমার একটা জায়গা হলো না? কিন্তু চাকরি না পাওয়ার হতাশায় আমি তখন ভুগছিলাম। তাই কোচিন বা চীন কোনোটাই আমার কাছে কোনো দূরত্বই নয়।

আপনি তো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছেন প'চিশে আগস্ট, তাই না ?

হ্যাঁ।

এখানে আসতে তিনটে দিন লেগেছে। গতকাল একটা ছুটির দিন অর্থাৎ সানডে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো দিন লেট করে আপনি এখানে এসেছেন। ঐ দুটো দিন কি করেছেন জানতে পারি কি ?

কলকাতা অফিসে ডিউটি করেছি। অমিতাভর সোজা উত্তর। মিঃ নামবিয়ার আমাকে জানিয়ে দিলেন, দুদিন কলকাতায় অফিস করে তুমি কোচিনে গিয়ে যোগ দেবে। এও বলেছেন, ইট ইজ এ কেস অফ সিম্পলি ট্রান্সফার। ব্যাপারটা আমার কাছে তখন খুবই অবাক লাগছিল। দুটো দিন চাকরি করার পর ট্রান্সফার ঘটনাটা কী ?

এটাই তো মিঃ নামবিয়ারের চালাকি। উনি ইউনিয়নকে ধোঁকা দিতে চাইলেন। দেখাতে চাইলেন আপনার এটা সত্যি সত্যি ট্রান্সফার কেস। নো কোশ্চেন অফ এনি নিউ রিক্রুটমেণ্ট। অথচ মূলতঃ এটা ফ্রেশ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। আমাদের নিয়মে আছে দুবছর একটানা এক জায়গায় থাকার পরেই কাউকে ট্রান্সফার করা যেতে পারে—তার আগে নয়। এখানে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো ? এবারে আসল কথায় আসা যাক। এখানকার আন্দোলনের ছবিটা আপনার কাছে পরিষ্কার নয়। আপনি যে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন তার নেপথ্যের কাহিনীটুকু আপনার জানা দরকার। ঘটনাটা হলো—পাদ্মনী ঊষা সহজ ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলো, ভারতবর্ষের সব কোম্পানীগুলোতেই একাধিক ইউনিয়নে ইউনিয়নে যখন রেষারেষিতে ব্যস্ত তখন আমাদেরটাই বোধহয় প্রথম যেখানে একটা মাত্র ইউনিয়ন। সব ক্যাটাগরির শ্রমিক-কর্মচারী আমাদের এই ইউনিয়নের মেম্বার। আমরা বছর দুই আগে ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে একটা এগ্রিমেণ্ট করেছিলাম। সাব-স্টাফদের মধ্যে কেউ যদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে তবে তাকে জুনিয়ার ক্লার্কে প্রমোশন দিতে হবে। রাজনের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গত দুমাস ধরে

এখানে একটা আন্দোলন করে চলেছি। ম্যানেজমেণ্ট কিছুতেই ওকে প্রমোশন দিচ্ছে না। এগ্রিমেণ্টও মানতে চাইছে না। ম্যানেজমেণ্টের এটা বিশেষ ধরনের একটা জেদ। মাঝে মাঝে ইউনিয়নের শক্তিটা যাচাই করে দেখার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যেখানে আন্দোলন করে চলেছি রাজনকে জুনিয়ার ক্লার্কে প্রমোশন দিতে হবে—সেই জায়গায় কী না আপনাকেই এখানে ম্যানেজমেণ্ট সুকৌশলে ঠেলে দিল। এই অবস্থায় আপনাকে আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি? আমরা জানি, আপনারও চাকরির প্রয়োজন আর আপনি আমাদের শত্রুও নন—যদিও আপনি এই মুহূর্তে আমাদেরই সেটা ভাবছেন কিন্তু আমরা নিরুপায়। নীতি থেকে সরে আসতে পারবো না। ম্যানেজমেণ্টের এই খেয়ালখুশি সেদিনই মেনে নেবো যেদিন আমাদের ইউনিয়নের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আশা করি আপনি আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। এই পর্যন্ত বলে পদ্মিনী কাকে যেন একটা ফোন করলো। ফোন শেষ করেই অমিতাভকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা, কলকাতায় কি আপনার মেডিকেল টেস্ট হয়েছিল?

না।

তবেই বুঝুন—মেডিকেল টেস্ট না হলে কারো অ্যাপয়েণ্টমেণ্টই বৈধ নয়। এক্ষেত্রে সেটাও মানেনি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন তো, ম্যানেজমেণ্ট যদি সত্যি সত্যিই আপনাকে চাকরি দিতে উৎসাহী হতো তাহলে এর একটা মানে বুঝি—আমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে নেমে আপনাকে সাটল কক হিসেবে ব্যবহার করছে। আগে আমরা রাজনের ব্যাপারটা নিয়ে সামলে উঠি, তারপরে অন্য কথা। প্রতি বছরই এগ্রিমেণ্টের সময় নিয়মবিরুদ্ধ যা খুশি তাই চাপিয়ে দেয়। এ জিনিসের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের সংগ্রাম বা আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কেনো উপায় নেই। আমাদের দেশে ম্যানেজমেণ্টের হাতে হাজারো আইনকানুন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ঐ একটা ছাড়া বাঁচার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর যাই হোক, আমরা তো পলায়মান চোরের

দর্প শুধু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না।

পদ্মিনী ঊষা টেবিলের কাগজপত্র একটু নাড়াচাড়া করে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার অমিতাভর দিকে দৃষ্টি ফেরালো। নতুন করে বলতে লাগলো, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা একটা খুবই সামান্য ব্যাপার। আপনাকে অনায়াসেই কলকাতায় রেখে দিতে পারতো। কিন্তু রাখলো না কেন? আমাদের আসল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে এই জিনিসটা করা। ম্যানেজমেণ্ট যদি জোর করে ইউনিয়নকে লড়াইতে নামিয়ে দেয় আমরা নিশ্চয়ই তামাশা দেখার জন্য ড্রইংরুমের সুখের মুহূর্ত কাটাবো না। ওরাও যে কাচের ঘরে বাস করছে এটা যেন ভুলে না যায়। তারপরেই নিচু সুরে অমিতাভকে প্রশ্ন করলো, আপনাকে থাকার জন্য কোয়ার্টার দিয়েছে?

আমি তো কোনো কোয়ার্টার পাইনি।

কলকাতা থেকে আসার সময় আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলেনি? প্রৌঢ় মতো একজন কমিটি মেম্বার বললেন, আপনি তাহলে গতকাল থেকে রয়েছেন কোথায়?

মিঃ নামবিয়ার আমাকে হোটেল বালসাম্মাতে উঠতে বলেছিলেন।

আপনি কি তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন হোটেল কেন? অমিতাভরই বয়সী একজন কমিটি মেম্বার বললো, ওটা তো পাকা-পাকি বন্দোবস্ত হতে পারে না।

আপনারা আমাকে যা যা প্রশ্ন করছেন—অমিতাভ কয়েকজনের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বললো, এগুলো তো আমারও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আপনাদের আগেই জানিয়েছি, চাকরি না পেয়ে আমি হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। তাই কোনো প্রশ্নই মিঃ নামবিয়ারকে করিনি। উনি শুধু আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'কোয়ার্টার পেতে একটু দেরি হতে পারে।

তবে সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি হোটেল বালসাম্মাতে গিয়ে উঠবে। খরচ কোম্পানীই করবে।’

দেয়ার আর সো মেনি আণ্ডারকারেণ্টস ওভার দেয়ার। পদ্মিনী মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, মিঃ নামবিয়ারের উদ্দেশ্য একটাই অথচ তিনি হাজারটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সবকিছুকে একটা জট পাকানো উলের বল তৈরি করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। এটা অবশ্য আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। গিঁট খোলার কাজে আমরা এখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠের সামনে এসে চারজন তেজী ছোকরা দাঁড়াতেই পদ্মিনী তার আসনে বসেই কোমল আহ্বান জানালো, ভেতবে আসুন। খালি বেঞ্চের দিকে চোখ রেখে ইঙ্গিত করলো, বসুন—

টগবগে ছোকরা চারজন বসতে বসতেই অমিতাভকে একবার চোখ বুলিয়ে চেটে নিল। অমিতাভ কিন্তু ওদেরকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। হ্যাঁ, ঐ চারজন ছেলেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেটা মনে রেখেই সে ওদেরকে না চেনার ভান করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলো।

পদ্মিনী ঐ চারজন ছেলেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এতো, বছর ইউনিয়ন করার পর আমাদের চেতনা বোধহয় আর বাড়ছে না। নয়তো শত্রু চিনতে আমরা এই ভুলটা কেন করলাম? অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ। নয়তো এম. কম. পাশ করে জুনিয়ার ক্লার্কের চাকরি নিয়ে এতো দূরে ছুটে আসবেন কেন? ম্যানেজমেণ্ট সবকিছু জেনেশুনে ওঁকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আর আমাদের এখানে একটা আন্দোলন চলছে—সেটা ওঁর জানার কথা নয়। আমরা অবিবেচকের মতো ওঁকেই আক্রমণ করে বসে রইলাম। এমন ভুল রাস্তায় গেলে ম্যানেজমেণ্ট সারা জীবনের জন্য আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ওঁদের হাত দুটোকে আমরা এইভাবে শক্ত করবো কেন? যেটা ঘটেছে আপনারা নিশ্চয়ই সেটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন। আশা করি কেরালার মানুষের প্রতি

কেউ শ্রদ্ধা হারাক—এটা আমরা কেউই চাই না। ভুল অবশ্যই হতে পারে, সেটা স্বীকার করার বলিষ্ঠতাও থাকা দরকার।

চমৎকার বক্তা পদ্মিনী ঊষা। অমিতাভর অন্তত তাই মনে হলো। প্রভাব বিস্তার করতে তার বক্তৃতা ওষুধের মতোই দ্রুত কাজ করে। সবচেয়ে বড়ো জিনিস, যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিটা কথা মনের বেশ গভীরে গিয়ে একটা স্থায়ী বাসার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ জটিল কোনো তত্ত্বের বিন্দুমাত্র প্রয়োগ নেই। পাণ্ডিত্য দেখাবার মনোভাবটা আশ্চর্য রকমের সংযমী। কলকাতায় অমিতাভ অনেক নেতাদের বক্তৃতা-টক্তৃতা শুনেছে। হাতড়ে বেড়াবার মতো সব লেকচার। মনকে নাড়া দেওয়া দূরের কথা, মানেই বোঝা যায় না--শুধু বোঝা যায় বক্তৃতাটা বড়ো বেশি কৃত্রিম। পদ্মিনী ঊষা সেদিক দিয়ে দাগ কাটতে পারে। সেটা বোঝাও গেল।

রাগী চারজন যুবকের শরীরে এখন আর বোধহয় রাগ-টাগ নেই। ওরা আগের মতো ফুঁসছে না। দৃষ্টিও শান্ত। ঝরনার জলে হাত-পা ধুয়ে ওরা হিংস্রতার ময়লাকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। চারজন ছেলেই বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে তাদের কী করতে হবে। পদ্মিনী ঊষা যা বলার যথেষ্ট বলেছে। এবার সে অপেক্ষা করে আছে তাদের বিবেকের ওপর। চারটি ছেলেই উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অমিতাভর কাছে। ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, উই আর সো স্যারি, প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড।

আণ্ডার দিস সিচ্যুয়েশন ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। আই নেভার মাইণ্ড। অমিতাভ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ হাসি বিলিয়ে দিল ঐ চারজনকে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই পদ্মিনী ঊষা আবার বলতে লাগলো, ওয়েল মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের বিবেচনায় যেটুকু আপনার পাওয়া উচিত সেটুকু নিশ্চয়ই পাবেন, বাট মর‍্যালি ইট ইজ নট পসিবল টু টেক ইউ ইন প্লেস অফ রাজন। সো উই মাস্ট অপোজ ইট।

আই হ্যাভ নাথিং টু সে ইন দিস রেসপেক্ট।

এবারে আমরা আমাদের কমিটি মিটিংটা সেরে নেবো। আপনি এখন আসুন।

ইউনিয়নের অফিস থেকে বেরিয়ে অমিতাভ সোজা পা চালালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দিকে। এবারে সে জানে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিভাগীয় প্রধান বা চিফ পার্সোনেল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণ কেউই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কেননা, তার ভবিষ্যৎ এখানে রীতিমতো অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এসবের সঠিক নির্দেশ দিতে ঐ একটি লোকই আছেন—মিঃ নামবিয়ার। সঠিক নির্দেশ বলতে—উনি তো তাকে গোলকধাঁধার মধ্যে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছেন। অমিতাভর বক্তব্য হলো, এই মুহূর্তে সে কী করবে সেই কথাটা তো ওঁকেই বলতে হবে। এক বছর বাদে চাকরি পেয়ে অমিতাভ যখন নিঃশ্বাস ফেলে একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, সেই মুহূর্তেই যদি আলগা মাটিতে পা পড়ে তাহলে ডুবে যেতে কতোক্ষণ!

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি এ হচ্ছে তোশিবা জেকব। ভদ্রমহিলার বয়স এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। আকর্ষণীয় ছিমছাম চেহারা। সারা দেহের কোথাও একফোঁটা মেদ নেই। সরু কোমরের নিচে বেশ কায়দা করে শাড়িটা এমনভাবে জড়ানো, সুগভীর নাভিকুণ্ডটি স্পষ্ট শুধু চোখেই পড়ে না—শরীরের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। তোশিবা জেকবের চোখ-নাকও বেশ কাটাকাটা। চোখের ওপরের পাতায় সবুজের আভা। এবং ভ্রূ দুটো ইচ্ছে মতো সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়েছে। ঠোঁট দুটো সামান্য একটু মোটা। সবসময়েই মনে হয় মুখের মধ্যে টফি বা এক কোয়া কমলা ঐ জাতীয় কিছু একটা রেখে দিয়েছে। পরনের ব্লাউজটাতে খুব বেশি কাপড় ব্যবহার করেনি। ফলে খাজুরাহোর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। গায়ের রংটা বেশ চাপা অর্থাৎ কালোই বলতে হবে। কিন্তু তার মনোরম ছবিটায় একবিন্দুও কালি পড়েনি। তবে তোশিবা জেকব বিবাহিতা কী অবিবাহিতা সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

সুতরাং মিস জেকব না মিসেস জেকব বলে সম্বোধন করবে—

অমিতাভ সেই সন্দেহের মধ্যে না গিয়ে পরিষ্কার একটা কথাই বললো, আমি একবার নামবিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তোশিবা জেকব মুখ তুলে চাইলো। চমৎকার চেহারার ঝকঝকে বছর পঁচিশের একটা ছেলে। চোখে-মুখে একটু অস্থিরতার ভাব তবে কথা বলার ধরনে বেশ আদেশ দেবার সুর রয়েছে। অন্য সময় হলে তোশিবা জেকব পত্রপাঠ বিদায় করে দিত নতুবা ঠায় ঘণ্টা দুই বসিয়ে রাখতো। এক্ষেত্রে সে কিছুই করলো না। অমিতাভর কথা শুনে সে বরং একটু উৎসাহই পেল। মনে হচ্ছে ছেলেটাই যেন তার 'বস'। তোশিবা নিখুঁত উচ্চারণ এবং মনকাড়া ভঙ্গিমায় ইংরেজীতে যা বললো তার বাংলা মানেটা দাঁড়ালো এই রকম, এমনভাবে হুট করে এসে দেখা করতে চাইলেই কি দেখা হওয়া সম্ভব? আপনার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে সাহেবের সঙ্গে আগে থেকে কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল না। সেক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। আমি এইটুকু আপনাকে বলতে পারি সাহেব এখন খুবই ব্যস্ত। ভেতরে জরুরি মিটিং চলছে। এই অবস্থায় আমি তাঁর বিরক্তির কারণ হতে রাজী নই।

প্লিজ সাহেবকে গিয়ে শুধু বলুন কলকাতার অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবেন।

আপনিই মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়! তোশিবা জেকব মিষ্টি করে হাসলো। আপনার নামটা আগে বলবেন তো। হ্যাঁ, সাহেব আপনার কথা আমাকে বলে রেখেছেন। আপনি এলে যেন পাঠিয়ে দিই।

অমিতাভ চট করে ভেবে নিল এই নামবিয়ার মানুষটা একজন চলমান শিল্পী। ভবিষ্যতের ছবিগুলো খুব ভালোই আঁকতে পারেন। সেই সঙ্গে মিশেছে নিখুঁত কল্পনাশক্তি। কোন ঘটনার পর কী ঘটবে এবং অমিতাভ যে তাঁকে আশ্রয় করবে এটা যেন ছকবাঁধা ব্যাপার। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি তাঁর পি এ তোশিবা জেকবকে আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। নয়তো তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভদ্রমহিলা এম ডি'র ঘরে ঢুকে যাবে কেন?

এক মিনিট বাদে তোশিবা জেকব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে বললো, আপনি ভেতরে যেতে পারেন।

অমিতাভর ইচ্ছে হচ্ছিলো একবার বলে, সাহেবের জরুরি মিটিং কি এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল? কিন্তু সেসব বলার মতো মানসিকতা ঐ সময়ে তার ছিল না। মানুষকে বোধহয় চিরদিনই উল্টো কাজটাই করতে হয়। তোশিবা জেকবকে সে কোনো কথা তো শোনালোই না, বরং ভদ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে এম ডি'র ঘরে ঢুকে গেল।

এম ডি'র ঘরখানা যেন একটা রাজপ্রাসাদ। পুরু এবং কোমল বাদামী রংয়ের কার্পেটে সারা ঘরটা আগাগোড়া বিছিয়ে দিয়ে পায়ের শব্দকে সংযত করা হয়েছে। ডিসটেম্পার করা মসৃণ বাদামী দেওয়াল। দেওয়ালে চমৎকার দুটো ছবি টাঙানো। সাদা বরফে ঢাকা একটা পাহাড় রোদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চিকচিক করছে। তার মাথার ওপরে খোলা নীল আকাশ। আর একটা ছবি হলো, লক্ষ লক্ষ নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে বিস্তৃত সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। জলের মধ্যে থেকে লাল সূর্য উঠছে। আর ঐ লাল আলোর ছটায় সারা ঘরটাই বুঝি আলোকিত হয়ে উঠেছে। এক-পাশের পুরো দেওয়াল জুড়েই জানলা। পেলমেটের মাথা থেকে ভারি এবং মনোরম কাজ করা এক বিশাল পর্দা ঝুলছে। ঘরের দুপাশে ঝকঝকে প্লাইউডের খোপ খোপ করা। মোট তিনটে বেশ বড়ো আকারের জয়পুরী ফুলদানি। সেখান থেকে ফুলের যে গন্ধ উঠছে বাতাস তা নিয়েই নিজের খেলায় মেতে উঠেছে। বুক-সমান হাইটের মেহগনি পালিশের বুক-সেলফ। সেখানে বই সাজানো। এম ডি অত্যন্ত আরামদায়ক একটা রিভলবিং চেয়ারের গহ্বরে বসে আছেন। সামনে কালো কাচের বিশাল টেবিল। বিভিন্ন রংয়ের তিনটে টেলিফোন এই মুহূর্তে শিশুর মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। টেবিলের ওপর কতো রকমের যে কলম এবং কোন কলমটা কী কাজে লাগে সেটা একমাত্র এম ডি'ই বলতে পারবেন। টেবিলের এপাশে আরও গোটা দশেক দামী দামী

চেয়ার। তিনজন ভদ্রলোক বসে আছেন। অমিতাভ অবশ্য একজনকে চিনতে পারলো। চিফ পার্সোনেল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণ গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবছেন। ঠাণ্ডা ঘরের এক ঝলক শীতল বাতাসে অমিতাভর শরীরটা জুড়িয়ে গেল বটে কিন্তু মনটা? সে বেশ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মিঃ নামবিয়ারের দিকে তাকাতেই তিনি ব্যগ্র সুরে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, পদ্মিনী ঊষা তোমাকে এতোক্ষণ ধরে কী বোঝালো। অমিতাভ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দেখে তিনি আর একবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো—

অমিতাভ বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনলো। মিঃ নামবিয়ার এই সময়ে সৌজন্যপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি উপস্থিত তিনজনের সঙ্গে অমিতাভর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটা যেন একটা বিশেষ ব্যবস্থা বলেই মনে হলো। মিঃ রামাকৃষ্ণাণকে বাদ দিলে বাকি দুজনের মধ্যে টাক মাথা চেহারার ভদ্রলোকটির নাম মিঃ পিল্লাই। উনি আই আর এম অর্থাৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার। অপরজন কোম্পানীর সেক্রেটারি মিঃ ফিলিপস।

একটা জিনিস অমিতাভর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মিঃ নামবিয়ার যতো বড়ো ম্যানেজিং ডিরেক্টরই হোন না কেন, এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি পদ্মিনী ঊষাকে বিশেষ সমীহ করেন। ঘরে ঢুকতেই তাকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছেন, 'পদ্মিনী ঊষা তোমাকে এতোক্ষণ ধরে কী বোঝালো', তাতেই সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। তার মানে তিনি সব খবরাখবরও রাখছিলেন। আবার নিজেদেরকে তৈরি রাখার জন্য মিঃ রামাকৃষ্ণাণ, মিঃ পিল্লাই এবং মিঃ ফিলিপসের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন—সে ব্যাপারে আলোচনাটাও সেরে নিচ্ছিলেন। ঝামেলার জোয়ারে অমিতাভই শুধু ডুবতে বসেছে। নতুন করে কিছু বলার মতো উৎসাহ ওর ছিল না। থাকার কথাও নয়। সে তাই অনেকটা দায়সারা গোছের উত্তর দিল, আপনি তো সব জানেন।

হ্যাঁ, সেকশনের মধ্যে যা হয়েছে সেটার খবর পেয়েছি। ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে গিয়ে পদ্মিনী তোমাকে কী বললো?

বললো, রাজনের জায়গায় আমাকে নেওয়াটা ইউনিয়ন বরদাস্ত করবে না।

আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি? মিঃ নামবিয়ার এক দৃষ্টিতে অমিতাভকে দেখতে লাগলেন।

ও যা সাংঘাতিক মেয়ে—অন্নপ্রাশনের সময় কী দিয়ে ভাত খেয়েছিল সেখান থেকে শুরু না করে ছাড়বে? মিঃ পিল্লাই মোক্ষম অভিমতটি দিয়ে হাসতে হাসতেই আবার বললেন, কলকাতায় কীভাবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেলেন সে ব্যাপারে কিছু জানতে চায়নি?

অমিতাভর নিষ্প্রাণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, জানতে চেয়েছিল।

আপনি সব বলে দিলেন? মিঃ ফিলিপস প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

লুকোচুরির তো কিছু ছিল না। অমিতাভ ঘুরিয়ে বললো, নামবিয়ার সাহেব আমাকে চাকরি দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কী অন্যায়?

সেটা ঠিক আছে। মিঃ নামবিয়ার অমিতাভকে আশ্বস্ত করে সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, তোমাকে তো পদ্মিনী বেশ ভালোই প্রোটেকশন দিয়েছে, তাই না?

প্রোটেকশনের কি আছে? অমিতাভ সোজাসুজি বললো, আমি এমন কোনো অন্যায় করিনি যার ফলে আমার ওপর হামলা হওয়া উচিত—পদ্মিনী ঊষা সেটাই বললেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও জানিয়ে দিলেন, আমার এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ওঁরা মানবেন না। কয়েক সেকেণ্ড সময় দিয়ে অমিতাভ ইচ্ছে করেই চুপ করে রইলো। মিঃ নামবিয়ার, মিঃ রামাকৃষ্ণাণ, মিঃ পিল্লাই, মিঃ ফিলিপসের মুখগুলো একে একে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফের মিঃ নামবিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে রইলো। খুব আস্তে অথচ প্রতিটা কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করলো অমিতাভ, স্যার, আমাকে কি এখান থেকে চলে যেতে হবে?

এ কথা আসছে কেন? মিঃ নামবিয়ার কথাটা শুনে বেশ

রেগে গেলেন। রাগটা যদিও অমিতাভর ওপর নয়। কিন্তু যাদেরকে উনি প্রতিপক্ষ ভাবছেন তাদের কেউই এখানে উপস্থিত নেই।

ওরা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

তুমি সিওর ?

রাজনকে নেওয়ার ব্যাপারে ওদের দারুণ একতাবন্ধ বলে মনে হলো।

সেসব চিন্তাভাবনা আমার। ভিখিরি তাড়াবার ভঙ্গিমায় ব্যাপারটা এক কথায় যেন মিটিয়ে দিলেন মিঃ নামবিয়ার। পরে বললেন, তোমার চলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি রোজ অফিসে আসবে তবে আপাতত কোনো সেকশনে গিয়ে বসবে না। মিসেস জেকবের ঘরেই সময়টা কাটিয়ে দেবে। এই মুহূর্তে তোমাকে কোনো কাজকর্মও করতে হবে না আর হোটেল বালসাম্মাতে যেমন আছো তেমনই থাকবে। বাকি ব্যাপারটা আমাদের।

নামবিয়ার সাহেব যা যা বললেন, কথাগুলো সবই অমিতাভর পক্ষে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কী পক্ষে ? হিসেবে প্রতিটি কথাই মারাত্মক। তার মতো অতি সামান্য একজন জুনিয়ার ক্লার্কের জন্য ম্যানেজমেণ্ট এতো কিছু চিন্তাভাবনা করছে কেন ? এতো সুযোগ সুবিধাই বা দিচ্ছে কেন ? বিশেষ কোনো গোপন উদ্দেশ্য না থাকলে কোনো কোম্পানীর কোনো ম্যানেজমেণ্টই এতোটা উদার হয় না। ঘটনাটা তো খুবই পরিষ্কার। অমিতাভকে ফুটবল হতে হবে। ম্যানেজমেণ্ট এবং ইউনিয়ন উভয় পক্ষই তাকে অপরের গোলে ঢোকাবার এক চ্যালেঞ্জের খেলায় মেতে উঠবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ম্যানেজমেণ্ট তাকে চিনতেও পারবে না। ইউনিয়ন নিশ্চয়ই ঠেলে ফেলে দেবে না। অমিতাভ তাই খোলা-খুলিই বললো, স্যার, আমি কী চিহ্নিত হয়ে পড়ছি না ?

কীসের ?

ম্যানেজমেণ্টের লোক হিসেবে।

তা কেন ? নামবিয়ার সাহেব ছেলে ভোলানোর মতো অমিতাভকে বোঝাতে লাগলেন, তুমি কিন্তু আগে আগেই ভাবছো।

ব্যাপারটা কী তাই ? তোমাকে আমরা সুদূর কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের দায়িত্ব নিশ্চয়ই এড়িয়ে যেতে পারি না। তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন ? মাই বয়, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এ বেড অফ রোজেস—সমুদ্রের চেয়েও বেশি ঝড়ঝাপটা তো এই সংসারেই। এখানে নিপুণভাবে সাঁতার কাটতে হবে। হাঁপিয়ে পড়লে বড়ো জোর ভেসে থাকবে কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় একমাত্র ভীতুরা। জীবনযুদ্ধে কাওয়ার্ডদের কোনো স্থান নেই। মিঃ নার্মবিয়ার আর একধাপ পাশে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, টেক মাই লাভ এণ্ড উইশ ইউ অল দ্য সাকসেস ইন ফিউচার। আমরা তোমার সঙ্গে আছি এবং থাকবো।

এম ডি'র ঘর থেকে বেরিয়ে অমিতাভ প্যাসেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। তাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। প্যাসেজের দুপাশে বড়ো বড়ো অফিসারদের কাচের ঘর। নার্মবিয়ার সাহেবের উল্টোদিকের ঘরখানাই তোশিবা জেকবের। আপাতত ওখানেই অমিতাভকে বসতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত হলে পরে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। অমিতাভ কিন্তু ঐ ঘরের দিকে গেল না। সামনের দিকে দুপা এগিয়ে যেতেই অবশ্য বাধা পেল। একজন বেয়ারা এসে খবর দিল, আপনাকে জেকব মেমসাব ডাকছেন।

অমিতাভ তোশিবা জেকবের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আপনি এখন অন্য কোথাও যাবেন না। আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাকুন। সাহেব সেই রকমই বলে দিলেন।

অমিতাভ যে একটু বিরক্ত হলো না তা নয়। চাকরি করতে এসে কি স্বাধীনতাও হারাতে হবে ? এখন থেকেই পায়ে বেড়ি পরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর সেই চাকরির স্বাদও তো পাওয়া গেল না যে কারণে এগুলোকে মুখ বুজে সহ্য করা যেতে পারে ! সুতরাং অমিতাভ তার বিরক্তিটা অন্যভাবে প্রকাশ করলো, আমার কি ক্ষিদে পায় না ?

আমি কি সেকথা কখনও বলেছি ? তোশিবা জেকব মধুর হাসলো। আপনি নিশ্চয়ই খাবেন। তবে এই মুহূর্তে নিচে

যেতে মানা করছি। পদ্মিনী ঊষা তার দলবল নিয়ে আসছে। কখন কি হয় বুঝতেই তো পারছেন। সাহেব আপনার জন্য খুবই চিন্তিত। সেই চিন্তার কিছুটা তো আমাকেও নিতে হয়।

হ্যাঁ, আপনি সাহেবের পি. এ এটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অমিতাভ করুণ হেসে বললো, আমার নিজের নামটাও এর পরে আমি মনে করতে পারবো না। যে সব ব্যাপার-স্যাপার এখানে চলছে আমি বোধহয় এসে ভুলই করেছি।

এটা কেন বলছেন? তোশিবা জেকব অমিতাভর হতাশার ভাবটুকু কাটিয়ে দিতে সহানুভূতির সঙ্গে বললো, এতো অল্পতে ভেঙে পড়লে চলে? না হয় কলকাতাতেই ফিরে যাবেন—তাই বলে কখনো গোমড়া মুখ করবেন না। আপনার বিমর্ষ ভাবটা দেখলে পদ্মিনী ঊষা নিজেকে বিজয়ী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। আপনার সঙ্গে সাহেবের সম্মানটাও জড়িত এটা ভুলে যাবেন না। যেন গোপন খবর দিচ্ছে এমনই নিচু সুরে তোশিবা জেকব ফিসফিস করে বললো, পদ্মিনী ঊষা এক্ষুণি সাহেবের সঙ্গে মিটিং করতে আসবে। যেন কিছুই হয়নি, আপনি এমনই একটা ভাব দেখাবেন কিন্তু। বুঝলেন?

যোগ্য সাহেবের যোগ্য পি এ। অমিতাভ ভাবতে লাগলো তার মনের দিকে তাকাবার কারো ফুরসৎ নেই। যে যার দিকটা বাঁচাতেই ব্যস্ত। সে এখানে চাকরি করতে নয়, যেন দুপক্ষের মর্যাদার লড়াই দেখতে এসেছে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে।

পদ্মিনী ঊষা তার পাঁচজন কমিটি মেম্বারকে নিয়ে তোশিবার ঘরে উপস্থিত হতেই সে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বললো, আসুন, আসুন পদ্মিনীজী, বসুন।

পদ্মিনী মিষ্টি করে হাসলো, বসবার সময় কোথায় দিচ্ছেন আপনারা? ঘাড়ের পাশে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলছেন, এখনও ঘুমোতে গেলেন না? ঘুমটা আসবে কোথা থেকে – যাক গিয়ে ওসব কথা, আমরা এসেছি, সাহেবকে খবরটা দিন।

আপনাদের তো সাড়ে এগারোটায় টাইম দেওয়া হয়েছে। এখনও মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। সময় হলেই ভেতরে চলে যাবেন।

হ্যাঁ, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা বাজতেই পদ্মিনী পাঁচজনকে নিয়ে এম ডি'র ঘরে ঢুকে পড়লো। নার্মবিয়ার সাহেব প্রত্যেককে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। যেন কিছুই হয়নি—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললেন, তারপরে বলুন পদ্মিনীজী—কী খবর ?

খবর তো স্যার আপনার কাছে। ভদ্রতায় কেউ কারো থেকে কম যায় না। তবে পদ্মিনী আর কথা বাড়ালো না ? ওপক্ষ কেমনভাবে এগিয়ে আসে সেটা আগে দেখা দরকার।

নার্মবিয়ার সাহেব হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজ করতে দিচ্ছেন না কেন ?

আপনি কেন রাজনকে প্রমোশন দিচ্ছেন না ? রাজন বি কম পাশও করেছে। আমাদের সঙ্গে যে এগ্রিমেণ্ট রয়েছে তাতে ঐ পোস্টটা তো ওরই পাবার কথা। আপনারা কেন ওকে বঞ্চিত করছেন ?

দেখুন, আগের এগ্রিমেণ্ট যখন হয় তখন আমরা এটা ঠিকই বলেছিলাম—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, তার মানে কি এই যে সব সাব-স্টাফ যে মুহূর্তে গ্রাজুয়েট হবে তখনই তাকে জুনিয়ার ক্লার্কের প্রমোশন দিতে হবে ? আমাদের উদ্দেশ্য হলো, প্রভিসনটা রাখা রইলো। তবে স্যুইটিবিলিটির প্রশ্নটা সবার আগে।

আপনারা এখন যে চমৎকার ব্যাখ্যাটা করলেন—এমন ব্যাখ্যা ইচ্ছে করে কাউকে গাড়ি চাপা দেওয়ার পরও অনায়াসেই করতে পারেন। পদ্মিনী অসাধারণ ঠাণ্ডা মাথায় বলতে লাগলো, সবচেয়ে অসুবিধাটা কোথায় জানেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যতোটা সম্ভব খোলা হাতটাই এগিয়ে দিই, আপনারা এগিয়ে আসেন আপনাদের নকল হাতটা নিয়ে। গণ্ডগোলটা বাধে সেই কারণেই। আপনারা যদি প্রতিটা বিষয়ের ওপর এমন নতুন নতুন ব্যাখ্যা জুড়ে দেন এবং শুধু তাই-ই নয়, একই কথার তেরো রকম মানে করে সুবিধে-মতো কাজে লাগান তবে আমাদেরও অন্য পন্থা ভাবতে হবে। আপনি আমার হাত

বাঁধতে এলে আমি নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারি না, আপনি আবার কষ্ট করে এখানে এলেন কেন? আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

মিস ঊষা, আমরা কিন্তু একবারও বলিনি সাব স্টাফ থেকে জুনিয়ার ক্লার্ক হবে না।

না, তা বলেননি। তবে স্যুইটিবিলিটির প্রশ্নটা জুড়ে দিয়েছেন, যেটা আগে ছিল না।

পদ্মিনীজী, আসছে সপ্তাহে বোম্বাইতে বোর্ড মিটিং রয়েছে। আমি বরং সেখানে এই পয়েণ্ট-এর ফয়সালা করে আসবো। মিঃ নামবিয়ার পদ্মিনী ঊষার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন। এই কটা দিন আপনারা অপেক্ষা করুন।

ফয়সালা তো আপনাদের ফেভারে যাবে।

আপনাদের ফেভারেও যেতে পারে।

তাহলে সেটা বোর্ড মিটিং-এর টেবিলে না তুলে আপনি তো এখানে বসেও তা করতে পারেন।

তেমনটা করতে পারি না। নামবিয়ার সাহেব হাসতে লাগলেন।

সময় নষ্ট করবেন, এই তো? অবশ্য উত্তেজনাকে চেপে রাখতে এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু চিরস্থায়ী বঞ্চনার যে পাহাড় গড়ে তুলেছেন তাতে সমাধানের রাস্তা ওটা নয়। পদ্মিনী বলিষ্ঠভাবে বললো, আমরা জানি এটা আপনারই হাতে, সুতরাং কাল হরণের খেলা অনুগ্রহ ক'রে করবেন না।

আপনার এই জানাটা ঠিক নয়। আমি যা খুশি তাই করতে পারি না। ইচ্ছাকৃত একটা অসহায় ভাব ফুটিয়ে তুলে মিঃ নামবিয়ার বললেন, আমাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

নামবিয়ার সাহেবের কপালের স্পষ্ট রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হলো। পদ্মিনীর কাছে ওগুলো রেখা নয়, লেখা। যেটা সে অনায়াসেই পড়ে নিতে পারে। এটা ঠিক, উপরওয়ালাদের শয়তানি ধরতে তার মতো জুড়ি নেই। মিঃ নামবিয়ারের চালকে বানচাল করতে পদ্মিনী ঊষা অত্যন্ত হালকা চালে বললো, বেশ, আপনি

যখন চাইছেন নিন। তবে একটা কথা, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ আপনারা যাঁকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছেন তিনি কিন্তু এই ক'দিন অফিস করতে পারবেন না।

সেটা কী করে হয়? মিঃ নামবিয়ারের কপালের ভাঁজ মোটা হলো।

এটাই হবে। পদ্মিনী এবারে শঙ্খিনীর মতো ফুঁসে উঠলো। আপনি যখন আমাদের ন্যায্য দাবিই মানছেন না, আমরা কেন তবে আপনার এই ব্যাকডোর দিয়ে লোক ঢোকানোকে সমর্থন করবো?

এটা বলবেন না। মিঃ পিল্লাই তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন, ব্যাক-ডোরের প্রশ্নই ওঠে না।

তবে কি এটা ফ্রণ্ট-ডোরের ব্যাপার বলে মেনে নেবো? পদ্মিনীর ডান পাশে বসেছিল ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক তরুণ সদস্য। ওর নাম শশীকান্ত। শশীকান্তই নির্ভীকভাবে ঐ প্রশ্নটা ম্যানেজমেণ্টের টেবিলে ছুঁড়ে দিল।

অফ কোর্স। মিঃ নামবিয়ার আরও ভেঙে বললেন, ওটা কোনো ফ্রেশ অ্যাপয়েণ্টমেণ্টই নয়। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না, অযথা আপনারা কেন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে প্রেস্টিজ ইস্যু করে তুলছেন?

সেই প্রশ্ন তো আমাদেরও। পদ্মিনী এবারে সোজাসুজি কথাটা জানিয়ে দিল, আমরা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেনে নিচ্ছি। আপনারাও রাজনকে প্রমোশন দিন। মীমাংসার জন্য এর চেয়ে সহজ ফরমুলা আর কী হতে পারে?

সেটা সম্ভব নয়। মিঃ নামবিয়ারের পরিষ্কার উত্তর।

এটা সম্ভব নয়, সেটা কী করে হয়—এই ধরনের কথা যদি বলেন তাহলে যেটা হওয়া উচিত সেটাই হোক।

কী? পদ্মিনীর মুখের ওপর থেকে মিঃ নামবিয়ার চোখ সরালেন না।

কথায় কথায় কাজ বন্ধ করাটা আমরাও পছন্দ করি না। আমরা তেমনটা করবোও না, যদিও আপনারা বাধ্য করাবেন ঐ পথেই যেতে। পদ্মিনী ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে ম্যানেজমেণ্টের সব

কটা মুখ এক ফাঁকে দেখে নিল এবং আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় বসে বললো, একটু আগেই আমি বলেছিলাম, 'অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক'টা দিন অফিস করতে পারবেন না।' কথাটার একটু সংশোধন করে নিচ্ছি। রাজনকে প্রমোশন না দিলে মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই কোচিনে আর অফিস করতে পারবেন না। এটা ইউনিয়নের শেষ সিদ্ধান্ত। কথাগুলো বলে পদ্মিনী আর মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না। তার পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে সংগে সংগে মিঃ নামবিয়ারের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ হুসেন। গত কুড়ি বছর ধরে পার্লামেন্টের সদস্য। দিল্লিতে থাকলেও যেহেতু তিনি কেরালার মানুষ এবং কোচিনেই তাঁর বাড়ি, সুতরাং এখানে তাঁকে আসতেই হয়। এই মুহূর্তে হুসেন সাহেবও কোচিনে রয়েছেন। তাঁকে ঘটনাটা জানানো দরকার।

পদ্মিনী ঊষা তার দলবল নিয়ে হুসেন সাহেবের বাড়ি যেতেই উনি অপত্য স্নেহের একরাশ রেণু ছড়িয়ে বললেন, কি খবর পদ্মিনীজী, আপনারা ভালো তো? হুসেন সাহেবের এই একটা বৈশিষ্ট্য। নিজের ছেলেমেয়ের বয়সী কাউকেও 'তুমি' করে বলতে পারেন না। শুধু পদ্মিনী কেন, অনেকেই অনেক বারই তাঁকে ঐ সম্বোধনের সংশোধন করতে অনুরোধ করেছে কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। এখন প্রত্যেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ভালো থাকলে আপনার কাছে আসবো কেন? পদ্মিনী সামান্য একটু হাসলো।

সেটাও তো একটা কথা। অভিজ্ঞ হুসেন সাহেব জানতে চাইলেন, আবার কি হলো? আপনাদের নামবিয়ার সাহেব নিশ্চয়ই নতুন কোনো প্যাঁচ কষেছে।

পদ্মিনী পুরো ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে জানিয়ে একটি মাত্র প্রশ্ন রাখলো, এবারে আমরা কী করবো?

আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মোটামুটি ঠিকই আছে।

তবে—হুসেন সাহেব কি যেন একটু চিন্তা করলেন। পরে শশীকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, কি নাম যেন বললেন ছেলেটার?

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন ওর গায়ে যেন হাত-টাত না পড়ে। ওটা খুব বাজে ব্যাপার। কেন না ম্যানেজমেণ্ট ওকে দিয়ে আপনাদের খেলাচ্ছেন। ছেলেটি কিন্তু কখনই ম্যানেজমেণ্ট নয়। আরও একটা কথা, ছেলেটিকে এরিয়ার মধ্যে ঢুকতে দেবেন না বলে যেটা ভেবে রেখেছেন সেটাও ঠিক নয়। ওকে ঢুকতে দেবেন। তবে কোনোরকম কাজকর্ম করতে দেবেন না। ম্যানেজমেণ্ট এই ব্যবস্থা বেশিদিন মেনে নিতে পারে না—আপনাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দেখবেন ওদের তখন বিরাট মাথাব্যথা।

রাত তখন দশটার কাছাকাছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে অমিতাভ হোটেলের টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সারাদিনে খুব একটা সিগারেট খেতে পারেনি। খাবে কখন? যেভাবে দিনটা কাটলো সেই মন খারাপের জন্য মেজাজটাই তার হারিয়ে গিয়েছিল। এখন সে আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলো, ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? কি প্রয়োজন ছিল তাকে নিয়ে এই টানা-হ্যাঁচড়ার? এটা ঠিক নামবিয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য মহৎ হলে তাকে অনায়াসেই কলকাতা অফিসে রাখা যেত। সেটা যে তিনি কেন করেননি এখন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইউনিয়নের সঙ্গে উনি টেক্কা দিতে চাইছেন, দিন। বিশাল ভারতবর্ষের ছোট-বড় বহু কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্টই সেই আকাঙ্ক্ষায় মশগুল থাকেন। কিন্তু সেটা কী তাকে বধ করে? আজকের দিনটায় অমিতাভ ভীষণভাবে ভাবছে সে বুঝি এক বধ্যভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। কি দরকার ছিল এতো দূরে চলে আসার? দীপ্তি এবং কমলা অর্থাৎ দুই বৌদিই কতোবার করে যে বারণ করেছিল তার কোনো লেখাজোখা নেই। না পেরে শেষে দুই জন অন্য সুর ধরেছিল, তুমি বেকার। দাদাদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছো। সেই কারণে আমরা তোমাকে প্রচণ্ড গঞ্জনা দিয়ে চলেছি—এটাই প্রমাণ করতে চাও তো? লক্ষ্মী ভাইটি, কি হবে কোচিনে গিয়ে? ক'টা টাকা

তুমি বাড়িতে পাঠাতে পারবে ? ও টাকা তুমি দুটো ট্যুইশানি করলেই পেয়ে যাবে।

না। বৌদিদের দাদাদের কোনো কথাই অমিতাভ শোনেনি। আসলে একটা বছর ধরে বেকার থেকে থেকে সে যা হোক একটা মুক্তি চাইছিল। সেই মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে সে এখন বিষাক্ত এক আবহাওয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতে ফিরে যাওয়াটাও কেমন যেন লজ্জার ব্যাপার। নিজের বাড়িটা আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকবে। লজ্জাটা বেড়ে যাবে পাড়ার মধ্যে। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যারা তার চাকরি পাওয়াতে নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছিল। আর সে নিজে যাকে লজ্জার এক অতল সাগরে ডুবে যেতে দেখবে তিনি রাখালকাকা।

অমিতাভ নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করবার জন্য গা থেকে সমস্ত অবসাদের চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। এখানেই সে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। দেখাই যাক না কী হয়! শেষ পর্যন্ত তার কলকাতা যাওয়া তো কেউ আটকাতে পারবে না। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে—আগাম চিন্তাভাবনার সমস্যায় নিজেকে তলিয়ে যেতে না দিয়ে হালকা মনে একটু খোলামেলা থাকাই ভালো। অমিতাভ আর একটা সিগারেট ধরালো।

একটু পরেই গঙ্গাধরম এলো। একগাল হাসি হেসে সে জিজ্ঞেস করলো, কি স্যার ঘুমাননি ?

এতো তাড়াতাড়ি তো কখনও ঘুমাইনি। অমিতাভ হেসে উত্তর দিল, কলকাতায় বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে বাড়িতেই ফিরতাম সাড়ে দশটায়। খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত সেই বারোটা।

কেন স্যার এতো রাত হতো কেন ? গঙ্গাধরমের সরল জিজ্ঞাসা।

খাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে কম করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট গল্প না করলে পরের দিন থেকে আমার খাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। একবার মায়ের সঙ্গে গল্প না করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফলটা কি হয়েছিল জানো ? নেক্সট দিন খেতে গিয়ে দেখি আমার খাবারটা মায়ের ঘরে চালান হয়ে গেছে। মা খুব গম্ভীর মুখ

করে বলেছিলেন, তুই তো সময় পাস না—তাই খেতে খেতে যেটুকু সময় পাওয়া যায় কথা বলার !

আপনার মা স্যার আপনাকে খুব ভালোবাসেন, তাই না ?

খুউব। মা তো এখানে মানে এতো দূরে আসতে দিতেই চাইছিলেন না। অথচ এখানে এসে কী যে ঝামেলায় পড়লাম !

আপনি তো রমন ফার্টিলাইজারে জয়েন করেছেন, তাই না স্যার ? আমার ঠিক খেয়াল ছিল না আপনাকে বলতে, ওখানে আমার খুড়তুতো ভাই রাজনও আছে। গঙ্গাধরমের কথাটা শেষ হতেই অমিতাভ সন্তর্পণে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, রাজন ?

হ্যাঁ, স্যার। ও এবারেই বি কম পাশ করেছে। ইউনিয়ন ওর জন্য খুব লড়ছে কিন্তু ম্যানেজমেণ্ট কিছুতেই রাজনকে সাব-স্টাফ থেকে জুনিয়ার ক্লার্কের প্রমোশন দিতে চাইছে না। অথচ ওদের ওরকম একটা এগ্রিমেণ্ট রয়েছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গঙ্গাধরম বললো, তবে স্যার আপনাকে এটাও জানিয়ে রাখছি ঐ পদ্মিনী ঊষা ম্যানেজমেণ্টকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

পদ্মিনী ঊষার বুঝি দারুণ ক্ষমতা ?

আমরা স্যার অতোশতো বুঝি না। শুধু জানি সারা কোচিনে উনি খুব পপুলার। শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন যেখানে পদ্মিনী ঊষাও সেখানে। এতো আন্তরিক এবং সাচ্চা নীতিতে বিশ্বাসী, ভাবা যায় না ! এবারের ইলেকশানে শুনছি পার্টি থেকে পদ্মিনীজীকে নমিনেশন দেবে। তবে মজার ব্যাপারটা কী জানেন স্যার, পদ্মিনী ঊষা প্রথমে যে কোম্পানীতে চাকরি করতেন সেই সংস্থার টপ ম্যানই হচ্ছেন ওঁর বাবা। শ'খানেক লোক কাজ করে সেখানে অথচ কোনো ইউনিয়নের নামগন্ধই নেই। এমনটা কিন্তু কোচিনের কোথাও পাবেন না। তিরিশজন লোক যেখানে কাজ করে সেখানেও মোটামুটি শক্তিশালী একটা সংগঠন আছে। ব্যাপারটা পদ্মিনী ঊষাকে ভাবিয়ে তুললো এবং ভাবনার ফসল ফলালেন রাতারাতি একটা ইউনিয়ন গড়ে তুলে।

পদ্মিনী উষা সেই কোম্পানী ছাড়লেন কেন ?

ঐ যে স্যার বললাম, সাচ্চা নীতিতে বিশ্বাসী তিনি।

কী রকম ?

পদ্মিনীজী থাকলে দাবিদাওয়া কিছুই আদায় হবে না। এটা তো ঠিক, বাবার বিপক্ষে কতো আর লড়াই চালানো যায় ? বাড়ি ফিরে এসে সেই বাবার সঙ্গেই এক টেবিলে খেতে হচ্ছে। মন দুর্বল হতে বাধ্য। সৈনিক তৈরি করে দিয়ে উনি তাই নিজেই সরে দাঁড়ালেন। একটা কথা মনে রাখবেন, রমন ফার্টিলাইজারের এই চাকরিটা কিন্তু পদ্মিনী উষা তখনও পাননি। এই ব্যাপারটা কোচিনের মানুষের মনে বেশ গেঁথে আছে।

অমিতাভ গঙ্গাধরমের কথাগুলো শুনছিল ঠিকই, তবে নিজেও নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করছিল। ছেলেটা কতো সহজে তাকে এতো কথা জানালো অথচ নিজের সম্পর্কে ওকে আসল ছবিটা না দেওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হবে। অমিতাভ চাপাচাপি করতে চাইলো না। কোনোদিন যেটা করেনি নতুন করে কি আর পারবে ? প্রথমে সে বললো, আচ্ছা গঙ্গাধরম, 'তুমি' করে বলছি বলে রাগ করছো না তো ?

না-না স্যার, কি যে আপনি বলেন ? তাছাড়া আপনি আমার থেকে পাঁচ-ছ' বছরের বড়ো। বলতে পারেন।

তুমি জানো কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে।

তা তো জানি না স্যার।

আমিও জানতাম না। তবে এখন বুঝতে পারছি রাজনের প্রমোশন আটকাতেই ম্যানেজমেণ্ট আমাকে ব্যবহার করছে। আমি হয়তো শিগ্‌গিরই তোমাদের কাছে আরও অপ্রিয় হয়ে উঠবো।

আপনি কেন ও আশঙ্কা করছেন স্যার ? আপনার তো কোনো দোষ নেই। ম্যানেজমেণ্টের গড়বড়িটা পদ্মিনী উষা নিজেই ধরতে পারবেন। ওঁকে ফাঁকি দিয়ে কোম্পানীর মাথাওয়ালারা একটা ব্যাপারও সারতে পারছেন বলে এখনও শোনা যায়নি।

আচ্ছা গঙ্গাধরম—

বলুন স্যার।

'তান্নে তিরু তান্নে তিরু চার্টার ডিম্যাণ্ড তান্নে তিরু'—এই কথাটার মানে কি ?

আজকে অফিসে শুনেছেন বোধহয়! গঙ্গাধরম হাসতে লাগলো। পরে বললো, 'চার্টার ডিম্যাণ্ড', এটার মানে তো বুঝতেই পারছেন। পুরো কথাটা হলো, তাড়াতাড়ি দাও, তাড়াতাড়ি দাবিদাওয়াগুলো মিটিয়ে দাও। গঙ্গাধরম এবারে আরও যোগ করলো, আর একটু গণ্ডগোল বাড়লেই দেখবেন নামবিয়ার সাহেব পুলিশ ফোর্স ইত্যাদি এনে হাজির করবেন। তখন স্লোগান উঠবে, 'অভাগা সঙ্ঘল চোদিচ্চল সিকিউরিটি আনো নামবিয়ার সারে।' অর্থাৎ কিনা ন্যায্য দাবিদাওয়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ নামবিয়ার মহাশয়টি ঠিক পুলিশ এনে হাজির করেছে: এরপরেই যে কথাটা নিশ্চিতভাবে উঠবেই উঠবে সেটা হলো, 'মুট্টিকেটিকম রাবারেপিকম কোট্টিকেটিকম নামবিয়ার সারে।'

মানে ?

ওর মানে হলো, নামবিয়ার মহাশয়ের মাথাটা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে রবারের মুকুট পরিয়ে ছেড়ে দাও।

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললো, মালয়লম ভাষাটা তো দেখছি তোমার কাছেই শিখে নিতে পারি।

খুব একটা অসুবিধে নেই স্যার। একটু সংস্কৃত জানলে আমাদের ভাষাটা মোটেই কঠিন নয়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো গঙ্গাধরম ?

আপনি এতো সঙ্কোচ করছেন কেন স্যার ? অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রাজনের প্রমোশনটা ম্যানেজমেণ্ট কেন দিচ্ছে না ? যেখানে এগ্রিমেণ্ট রয়েছে সেখানে না করার কী যুক্তি ? তোমার তো ভাই —জানো কিছু ?

শুধু ভাই না স্যার, আমরা দুজন বন্ধুও। সপ্তাহে দুদিন আমি বাড়ি যাই। রাজন আর আমি এক সঙ্গেই ঘুমাই। নিজের ভাই বলে বলছি না স্যার—গঙ্গাধরম আবেগ নিয়ে বললো, ওর

আত্মসম্মান জ্ঞানটা অনেকের থেকেই প্রখর। আর দারুণ স্পষ্ট-বাদী। অবশ্য ও ভুগছে এই কারণেই। ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। চিঠি-চাপাটি আর ফাইলপত্র নিয়ে নামবিয়ার সাহেবের ঘরে দৌড়ঝাঁপ করাই ছিল রাজনের কাজ। সাহেবরা সাধারণত যা করে থাকেন, নামবিয়ার সাহেবও ঠিক তাই-ই করলেন। একদিন বললেন, রাজন, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও তো। আদেশ করাটা যে ভুল জায়গায় হয়েছিল সেটা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাই পকেট থেকে টাকা বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরতেই রাজন অপমানে ছিটকে পড়লো। গম্ভীর গলায় একটি কথাই বলেছিল, ওটা আমার কাজ নয় স্যার। নামবিয়ার সাহেব অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, সারা ভারতবর্ষের তোষামোদের ছবিটার কথা। বাবু স্টাফরা যেখানে সাহেবদের বাড়ির কাজটাও নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় সেখানে কিনা সামান্য একজন সাব-স্টাফের মুখে এতো বড়ো স্পর্ধার কথা! এ তো রীতিমতো বিপ্লব! নামবিয়ার সাহেব বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ মানুষ। রাজনকে আর একটা কথাও বলেননি। নীরবে যেটা করলেন সেটা তো স্যার এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। রাজনের প্রমোশনের চিঠিতে সই করা আর নিজের হাতটা কেটে ফেলা একই ব্যাপার। অপমানের জ্বালার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। একটু সময় চুপ করে থেকে গঙ্গাধরম বললো, আপনার মতো স্যার রাজনও নামবিয়ার সাহেবের শিকার।

এই ঘটনা পদ্মিনী ঊষা জানেন?

নামবিয়ার সাহেবের স্ত্রী পর্যন্ত জানেন। গঙ্গাধরমের মুখে ঝকঝকে হাসি।

কী রকম?

একটা জিনিস দেখবেন স্যার, কোনো অনুষ্ঠানে সভাতে বড়ো বড়ো মন্ত্রী বা নেতারা যখন আসেন, গরীব বাচ্চাদের সামনে পেলে ওদের ঐ নোংরা গালেও হাত বুলিয়ে আদর করেন। এটা একটা রাজনৈতিক বিলাস। এই কায়দাটা মিসেস নামবিয়ারও শিখেছেন বা জানেন। সেবারে রমন ফার্টিলাইজারের একটা

অনুষ্ঠানে উনি প্রতিটি সাব-স্টাফের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলেছেন। কিন্তু রাজনের দিকে মুখভার করেছিলেন। আমি যখন রাজনকে এ নিয়ে ঠাট্টা করি ও তখন হেসে হেসে উত্তর দেয়, মিসেস নামবিয়ার ভীষণ কৃপণ। হাসতে জানেন না।

অমিতাভ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বললো, তুমি কিন্তু চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারো। তেমনভাবে বোধহয় লিখতে পারো না, তাই না?

কেন স্যার, একথা বলছেন কেন? গঙ্গাধরম হাসির মধ্যেই ডুবে রইলো।

তুমি বি এ পরীক্ষায় ফেল করলে কিভাবে সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।

কী করা যাবে! আমি তো স্যার পাশ করতেই চেয়েছিলাম। গঙ্গাধরম খুব সহজ ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, আমি আর রাজন একই সঙ্গে পরীক্ষা দিই। পড়াশুনাতেও দুজনে সমান। তবে ঐ যে বললাম, অপমানের জ্বালার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। ঐ জেদটাই ওর ভেতরে কাজ করছিল। এবারে স্যার আমাকেও একটা কিছু করতে হয়। কেন না বি এ ফেল আর পাশের মধ্যে পার্থক্যটা বিরাট। সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানেন স্যার— কেরালার মানুষ অশিক্ষিত হয়ে থাকাটাকে ক্রাইম মনে করে। এখানে কাজের মধ্যে কোনো ছোট-বড়ো নেই, তবে মূর্খকে সবাই অবজ্ঞা করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সারা দেশের মধ্যে এখন কেরালাতেই শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি। ঠিক অহমিকা নয়। স্নিগ্ধ এক গর্বের আলোতে গঙ্গাধরমের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই অমিতাভ প্রথম যে কথাটা ভাবলো, সেটা হলো, কাল সকাল সকাল না উঠলেও চলবে। নামবিয়ার সাহেব তাকে অফিস করার কথা প্রথমে বললেও শেষ মুহূর্তে কি ভেবে যেন নির্দেশ দিলেন, মঙ্গল এবং বুধ এই দুটো দিন তুমি

অফিসে এসো না। বৃহস্পতিবার থেকে যথারীতি আবার আসবে। টেনসনটা একটু কাটিয়ে নেওয়া ভালো।

কি ভালো হবে আর হবে না ও নিয়ে অমিতাভর এখন আর মাথাব্যথা নেই। যা খুশি হোক, তবুও একটা কিছু ফয়সালা হয়ে যাক। সে দুটো দিন ছুটি পাচ্ছে এটাই যথেষ্ট। হঠাৎ জেমস গনসালভেসের নামটা অমিতাভর মনে পড়লো। মিঃ সুন্দরম বলে দিয়েছিলেন, কোনো অসুবিধে হলে জেমস গনসাল-ভেসের সঙ্গে দেখা কোরো।

পরদিন বেলা পৌনে এগারোটা নাগাদ অমিতাভ ভেনডুরথী রোডে সরোজা ট্রান্সপোর্টের অফিসে পেঁছে গেল। এই অফিসের টপ ম্যানই হচ্ছেন মিঃ জেমস গনসালভেস। স্লিপ পাঠিয়ে তিন মিনিটও সময় গুনতে হলো না। তার আগেই উনি ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুকেই অমিতাভ দেখতে পেল মানুষটা একমনে ফাইলের ওপর কি যেন নোট লিখে চলেছেন। জেমস গনসালভেস কেরালিয়ান ক্রিশ্চিয়ান। বেশ গোলগাল চেহারা। গায়ের রং কালো বললে খুব কমই বলা হবে। এতো কালো মানুষ অমিতাভ বোধহয় এর আগে দেখেনি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো ঐ কালোর মধ্যেই তাঁকে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সাদা হাফ শার্ট এবং মেরুন রংয়ের টাইয়ে তাঁকে আরও স্মার্ট লাগছে। বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশও হতে পারে, কিংবা পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশও হতে পারে। চেহারায় তরুণ। শুধু মাথার চুলে সাদা আভাস।

লেখাটা শেষ করে ফেললেন জেমস গনসালভেস দু'মিনিটের মধ্যেই। তারপরে মুখ তুলেই অমিতাভকে একটা ধমকই লাগালেন, আশ্চর্য মানুষ তো মশাই আপনি! এতোক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন! এই চেয়ারগুলো রয়েছে কী করতে? পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে নিজের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, ফাঁকা থাকলেও এইটাতেই শুধু বসবেন না—বাদবাকি সব আসন আপনাদেরই। কথার শেষে আবার একঝলক হাসি। বোঝা

গেল জেমস গনসালভেস হাসতে ভালোবাসেন এবং চমৎকার ইংরেজি জানেন। আরও বললেন তিনি, নতুন করে পরিচয়ের কিছু নেই। আপনার সম্পর্কে সুন্দরম সাহেব ফোনে আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন।

সব বলতে ?

এই ধরুন আপনার নাম, কোয়ালিফিকেশন, কলকাতা থেকে আসছেন, কোচিনের রমন ফার্টিলাইজারে জয়েন করেছেন এইসব আর কি! হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, ওঁরা দুজনেই আপনাকে ছেলের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম করে দেখেন না। য়ু আর লাকি এনাফ। আয়্যাম অলসো। আমার কথা এখন থাক—আপনার কথা বলুন, এনি প্রবলেম ?

অমিতাভ একটু ইতস্তত করছিল। কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া প্রথম আলাপেই নিজের অসুবিধার কথা তুলে অপরকে বিব্রত করাটা ঠিক নয়। সে বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললো, দুটো দিন যাক স্যার। পরে একদিন এসে আপনাকে জানিয়ে যাবো। আজকে আপনার সঙ্গে এমনিই আলাপ করতে এলাম স্যার—

ওসব স্যার-ফ্যার ছাড়ুন তো। জেমস গনসালভেস প্রায় গর্জে উঠলেন, য়ু আর বেঙ্গলী পিপল। আমি জানি আপনারা বড়োদের দাদা-টাদা ঐ জাতীয় কিছু একটা বলেন। সুতরাং আমাকেও দাদা বলেই ডাকবেন। তবে এখানে মানে বেঙ্গলের আউট সাইডে 'দাদা'র মানেটা কি জানেন তো ? চেয়ারে হেলান দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো দুলতে দুলতে দমকে দমকে হাসতে লাগলেন জেমস গনসালভেস। স্রেফ মাস্তান, বুঝেছেন—

তা তো বুঝলাম কিন্তু আপনি কি আমার সঙ্গে আপনি আপনি করেই কথা বলবেন ?

দশ মিনিট এখনও কাটেনি ভাই—হাসির তুফান এক্সপ্রেস চালিয়ে জেমস গনসালভেস বললেন, আমার চেয়ে বয়সে ছোট তো বটেই ; আমার সমানবয়সী কাউকেও দশ মিনিট কথা বলার পর আপনি করে সম্বোধন করেছি বলে তুমি কোনো রেকর্ড পাবে না।

ওসব আপনি-ফাপনি আমার আসেই না। ইংরেজীতে ওটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু হিন্দি বাংলাতেই বড়ো বেশি হোঁচট খেতে হয়।

অমিতাভ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদা—

তার কথাটা সে শেষ করতেই পারলো না। তার আগেই গনসালভেস লাফিয়ে উঠলেন, এই অমিতাভ, ডাইরেক্ট দাদা ডাকটা শুনে নিজেকে সত্যিই মাস্তান মাস্তান মনে হচ্ছে। ওটা চলবে না এই দেশে। দুধের মধ্যে একটু জল মেশাতেই হবে।

দুধের মধ্যে জল ?

তাই বৈকি! জেমস গনসালভেস মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। এই ব্যাপারটাও তোমাদের কলকাতায় হেভি চালু। নামের সঙ্গে শুধু একটা দা জুড়ে দেওয়া। সবদিক বজায় রাখতে এই সিস্টেমটা কিন্তু মন্দ নয়। নাম ধরে ডাকাও হলো আবার সম্মান জানানও হলো। সো আই লাইক টু প্রেফার জেমসদা—জেমস গনসালভেস অট্টহাসির ড্রাম বাজালেন। হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে ?

আপনার চেয়ে বয়সে বড়ো—এমন মানুষকেও কি দশ মিনিট পরে 'তুমি' করে সম্বোধন করেছেন ?

করেছি কি, ওটা তো আমার অভ্যেস। নিজেকে শুধু সংযত করে রাখি। তবে দুবার মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি। সে কী গালাগাল আমাকে! মশাই, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি। জিভের মধ্যে কি 'তুমি' করে বলার যন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন ? দুবারের ঘটনাই তোমাদের ঐ কলকাতায়।

কলকাতার কোথায় ?

কাঁচড়াপাড়ার জেসিলীন রোডে। ওখানে আমার বোন থাকে। বছরে একবার সেখানে আমাকে যেতেই হয়। সেটা হলো পঁচিশে ডিসেম্বর। সে যাক গিয়ে—জেমস গনসালভেস হৈ হৈ করে উঠলেন, আমি কিন্তু দিন দিন খুব অভদ্র হয়ে উঠেছি। তোমাকে এখন পর্যন্ত এক কাপ কফিও খাওয়ালাম না। বলেই টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বোতামে হাত রাখলেন।

দরজার ফাঁকে একটা মুখ উঁকি দিতেই জেমস চিৎকার করে উঠলেন, তোদের বুদ্ধিগুলো কী সব আমারই মতো? আমার বোনের দেশের ছেলেটা সেই কতোক্ষণ ধরে বসে আছে! এক কাপ কফি দিতেও কি তোদের হাতে নোটিশ ধরাতে হবে? তাড়াব। সব কটাকে তাড়াব। আমাকেও তাড়াব।

যার উদ্দেশে বলা সে কিন্তু বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলো না। অর্থাৎ জেমস সাহেবের কথাবার্তার সঙ্গে যে বিশেষ পরিচিত সেটা বোঝা গেল ওর নির্লিপ্ত মুখখানা দেখে। সব কথা শুনলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। মাঝখানে অথবা শেষে উত্তর দেবার কোনো প্রশ্ন নেই।

ইতিমধ্যে একটা মেয়ে এসে জেমস গনসালভেসের টেবিলে চারখানা টাইপ করা চিঠি মেলে ধরতেই তিনি খসখস করে চারটে সই করে দিলেন। চিঠিগুলো নিয়ে চলে যাবার সময়ে মেয়েটি বললো, স্যার, আমি একটু বেরুবো। ঘণ্টা দেড়েক বাদেই ফিরে আসবো।

সিনেমায় যাবে?

না স্যার, কক্ষণো না।

শ্রীকলাতে যে ইংরেজী ছবিটা এসেছে ওটাও ঘণ্টা দেড়েকের বই কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। চাপা হেসে জেমস বললেন, যাও যাও, আর ভিড় বাড়িও না। যেখানে যাবে বলে ঠিক করেছো চলে যাও।

মেয়েটি চলে যাবার পরেই জেমস গনসালভেস অমিতাভর মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপরেই আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, তোমার প্রবলেমটা আমাকে খুলে বলো তো! কোনো অসুবিধে আছে?

না-না অসুবিধের কি?

তাহলে বলো।

একজন এসে এক ফাঁকে কফি দিয়ে গিয়েছিল। কফির কাপে চুমুক বসিয়ে অমিতাভকে একটু চিন্তা করতে হলো কোন কোন ঘটনা বলবে এবং কোনটা না বললেও চলবে! শেষে ঠিক করলো।

পুরোটা বললেই বা দোষের কি ? একটু সময় লাগবে এই যা— তাহলেও বলার মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা উচিত নয়। অমিতাভ রমন ফার্টিলাইজারের ছবিটা চমৎকারভাবে এঁকে দিল।

সব কথা শোনার পর জেমস গনসালভেসের মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে এলো, কঠিন পরিস্থিতি।

সত্যিই পরিস্থিতি কঠিন।

আয়্যাম টেলিং য়ু ভেরি ফ্রাঙ্কলি অমিতাভ, য়ু কান্ট স্টে ওভার হিয়ার। ম্যানেজমেণ্ট যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, পদ্মিনী ঊষার সংগঠনের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি নয়। মেয়েটার বড়ো গুণ কি জানো ? লড়াই করার মানসিকতা। নিজে অনেস্ট এবং সিনসিয়ার বলেই নীতি থেকে কখনও এক পাও সরে আসেনি। রাজনের প্রমোশন না হলে তোমাকে ও কিছুতেই মেনে নেবে না। ওর যা চরিত্র নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে ওকে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই-এ নামতেই হবে। মধ্যে থেকে পড়ে পড়ে মার খাবে তুমি।

আমাকে কি করতে বলেন ?

রেজিগনেশন লেটারটি মিঃ নামবিয়ারের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে বলি। অথবা মজা দেখতে। যেটা তোমার খুশি। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলে না তো ?

জেমসদা, একটু বুঝিয়ে বলুন। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে অমিতাভ তাকিয়েই রইলো। আরে বাবা, সরোজা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর চাকরি তো তোমার বাঁধা। আর রমন ফার্টিলাইজারের থেকে স্যালারিও খুব একটা খারাপ পাবে না।

মানুষ বিপদে পড়লে খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় বটে কিন্তু তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে কারুরই কোনোরকম আশা থাকে না। তবে প্রথম থেকেই যদি কেউ শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াবার সুযোগ পায় তার মতো ভাগ্যবান আর ক'জন ? জমাটবাঁধা ঘন অন্ধকারের দেওয়াল ভেঙে এই আলোকে সবাই দেখতে পায় না। অমিতাভ আপ্লুত কণ্ঠে শুধু ডাকলো, জেমসদা !

নো জেমসদা। জেমস গনসালভেস পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন,

এটা তোমার জেমসদার কোম্পানী নয়। নয় তার বাবারও। আমি তোমার কিছুই করছি না। যা করার সুন্দরম সাহেবই করবেন।

সুন্দরম সাহেব!

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই সরোজা ট্রান্টপোর্টের মালিক তো তিনিই। তিনি এবং সরোজা দেবী তোমাকে ছেলের মতো দেখছেন—তুমি কেন অন্য সংস্থায় গিয়ে গুঁতোগুঁতির মধ্যে থাকবে? ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, কোচিন এবং ত্রিবান্দ্রমে চার চারটে অফিস আমাদের, যেখানে খুশি তুমি সেখানেই বসতে পারো। চাই কি সুন্দরম সাহেবের বাড়িতে বসেও এই চারটে অফিসকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারো। জেমস গনসালভেস উদাত্ত গলায় হাসতে হাসতে আরও যোগ করলেন, চারটে-পাঁচটা দিন যেতে দাও। আমি এদিকের কাজগুলো একটু সামলে-সুমলে উঠি তারপরে সুন্দরম সাহেবের নির্দেশ নিয়ে সেই মতো ব্যবস্থা করবো। তুমি শুধু একটা কাজ করবে। রেজিগনেশন লেটারটা যেদিন নিখুঁত নিশানায় নাকের ওপর ছুঁড়তে যাবে সেদিন আমাদের ট্রান্সপোর্টের বিরাট সাদা রংয়ের বুইক গাড়িটা নিয়ে যাবে। এনি মোর প্রবলেম? জেমস গনসালভেস এবারে আর উত্তাল হাসি নয়—শিশুর মতো মিষ্টি করে হাসতে লাগলেন।

হোটেল বালসাম্মায় ফিরে এসে অমিতাভ টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। মাথায় রোদ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং বাস জারনি ইত্যাদি করে ক্লান্ত লাগাটাই স্বাভাবিক। অথচ কী আশ্চর্য! এই মুহূর্তে সে ওসব কিছুই অনুভব করলো না। বরং নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। কোচিনে এসে এতোটা নিশ্চিন্ত হওয়া এই প্রথম।

একটা ব্যাপার কিন্তু বেশ ভাববার বিষয়। অমিতাভ মিঃ সুন্দরমের কথাই ভাবছে। কী চমৎকার শান্ত এবং ধীর-স্থির মানুষ। তাঁর যে এতো বড়ো একটা কোম্পানী রয়েছে সে কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানাননি। অথচ কি নরমভাবে বলেছেন, 'তুমি যদি কোনো অসুবিধা বোধ করো জেমস গনসালভেসের সঙ্গে

দেখা কোরো।' অর্থাৎ নিজেকে আড়াল করে, প্রচারের বাইরে রেখে জেমসকেই মর্যাদা দিয়েছেন। এটা সবাই পারে না। এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও সহজেই উঠতে পারে। অমিতাভ কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। মিঃ সুন্দরমও ভুবনেশ্বর থেকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই সফর করেছেন। তিনি যেখানে এয়ার কণ্ডিশন কোচে জারনি করতে পারেন সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেন? পয়সা বাঁচানোর প্রশ্নও ওঠে না। আসলে মানুষটার প্রকৃতিই হয়তো ভিন্ন। বিলাসিতা করার ক্ষমতা আছে বলেই সেই বিলাসিতার মধ্যে ডুবে যেতে হবে এমনটা ঠিক নয়। তিনি তাই সহজ জীবনযাত্রাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আর বাড়াবাড়ির ব্যাপারটাকে সযত্নে এড়িয়ে প্রয়োজন মতো নিজেকে তৈরি করেছেন।

এখানে এসে বাড়িতে এখনও চিঠি লেখা হয়নি। আর দেরি করা উচিত নয়। মা এবং বৌদিরা বারবার বলে দিয়েছিলেন, গিয়েই পেঁছনোর সংবাদ দিবি। আমরা খুব চিন্তায় থাকবো। সেই চিন্তাটা অবশ্যই দূর করা দরকার। অমিতাভ উঠে বসলো। যতো শুয়ে থাকবে আরাম বোধটা ততোই পেয়ে বসে। এই করে শেষ পর্যন্ত হয়তো চিঠিটাই লেখা হয়ে উঠবে না। অমিতাভ টেবিলে বসে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যে দুখানা চিঠি শেষ করে নিজেকে ভারমুক্ত বলে মনে হলো। না, অমিতাভ এখানকার গণ্ডগোলের একটুও আঁচ দেয়নি। দেওয়াটা উচিত নয় বলেই দেয়নি। শুধু শুধু চিন্তায় ফেলে কী লাভ? মা বড়ো অল্পতেই অস্থির হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে অমিতাভর যদি কোনো ব্যাপার হয়। তাছাড়া সুরাহা তো একটা হয়েই গেছে। রমন ফার্টিলাইজারে চাকরির নিরাপত্তা না হলে সরোজা ট্রান্সপোর্টে হবে। সুতরাং আপাতত জটিল ঐ অধ্যায়টা নিয়ে চিঠিতে আর জট না পাকানোই ভালো। সে লিখলো, আমি ঠিক মতো কোচিনে এসে পেঁছেছি। পথে কোনো অসুবিধে হয়নি। অফিসেও জয়েন করেছি। তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি।

বাড়িকে নিশ্চিন্ত করার জন্য এর চেয়ে বড়ো চিঠির আর কি দরকার ?

বুধবার দিন বেলা তিনটে নাগাদ গঙ্গাধরম হঠাৎ অমিতাভর ঘরে এসে জানতে চাইলো, স্যারের প্রোগ্রাম কী ?

সকাল থেকে যা চলছে খাওয়া আর ঘুম। কিন্তু তুমি চললে কোথায় ? অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

বাড়ি স্যার। গঙ্গাধরম একগাল হেসে বললো, আগামীকাল আবার এমন সময়ে এখানে এসে যাবো।

এসো তাহলে—অমিতাভ ওকে বিদায় জানালো।

গঙ্গাধরম কিন্তু নড়লো না সলজ্জভাব নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতে লাগলো। কি যেন একটা বলার ইচ্ছে রয়েছে অথচ মুখও খুলছে না। বায়না করে দাবির জিনিসটা পাওয়ার পর বাচচা ছেলেরা দুষ্টুমিভরা চোখ নিয়ে যেভাবে হাসে, গঙ্গাধরমেরও তখন সেই অবস্থা। অমিতাভ শান্ত হেসে বললো, তুমি কিছু বলবে ?

ঐ জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁড়িয়ে থাকলেই বলা হবে ?

বলছিলাম কি—ত্রিপুনীথুরা থেকে সরকারি বাসে আমাদের বাড়ি মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। আপনি যাবেন স্যার ? গঙ্গাধরমের চোখে-মুখে একটা আকাঙ্ক্ষার জলছবি। ছবিটাকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। কেননা এটা কোনো নিয়মমাফিক ব্যাপার নয়-এর পেছনে রয়েছে আন্তরিক একটা টান। অনেক আশা নিয়ে যে ছুটে এসেছে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়াও একটা পবিত্র কাজ। অমিতাভ ছোট্ট করে বললো, চলো।

সরকারি ছ'নম্বর বাসটা ওদের যেখানে নামিয়ে দিল সেই জায়গাটার নাম ব্রহ্মপুরম। পাকাবাড়ি নেই বললেই চলে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খোলার চালের অথবা শনের বাড়ি। লাল মাটির দেওয়াল। বাস রাস্তা ধরে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গিয়েই

বাঁ দিকের লাল সুরকির পথে নেমে পড়লো ওরা। ডান পাশে পরপর দুটো পুকুর। চমৎকার টলটলে জল। বেশ কয়েকটা হাঁস ডানা ঝাপটে পঁ্যাক পঁ্যাক আওয়াজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট উলঙ্গ কয়েকটা শিশু কঞ্চি হাতে ওদের মারবেই। শেষ পর্যন্ত সব কটা হাঁস নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য জলে নেমেও বেশ কিছুটা ভেতরে চলে গেল। শিশুরা পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে দাঁত বের করে বলতে লাগলো, পো কারুতর। পো কারুতর।

কথাটা শুনে অমিতাভ গঙ্গাধরমের মুখের দিকে তাকাতেই সে উত্তর দিল, ওরা স্যার হাঁসগুলোকে চলে যেতে বারণ করছে। 'পো কারুতর' মানে চলে যেও না।

সাঁওতাল মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাচতে নাচতে এক সময় যেমন মাঝখানে এসে জড়ো হয়, ঠিক তেমনিভাবে গায়ে গা লাগিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ঘর একে অন্যকে ধরে রেখেছে। সামনে সবুজ ক্ষেত। আর এক পাশে ফাঁকা জলাজমি। দূরে দেখা যাচ্ছে আর একটা গ্রাম। গঙ্গাধরম মেঠো পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ অমিতাভকে বললো, কাজুর বনটাকে দেখুন স্যার। আর এটা হলো তেজপাতা গাছ। সুপারি গাছগুলোকে বেয়ে লতানো যে গাছের সারি দেখছেন ওগুলো হলো গোলমরিচ। এই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট থোকায় থোকায় গোলমরিচগুলো ঝুলছে। এখন সবুজ লাগছে। গাছ থেকে ছিঁড়ে রোদে শুকোবার পর সব কালো হয়ে যাবে। তেজপাতাও তাই।

কাজুবাদামের বনের শেষেই আর একটা গ্রাম। এটা দক্ষিণ ব্রহ্মপুরম। এখানেই গঙ্গাধরমদের বাড়ি। অমিতাভ হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালো। বাস থেকে নেমে পুরো কুড়ি মিনিটের পথ হেঁটে এসেছে। অথচ মনেই হয়নি দূরত্বটা এতো!

গঙ্গাধরমদের বাড়িটা এক কথায় চমৎকার। মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের চারপাশে চারখানা টানা খোলার চালের ঘর। উঁচু দাওয়া। মাটির দেওয়ালগুলোকে সিমেন্টের মতোই মনে

হয়। নিশ্চয়ই দুবেলা কেউ লেপামোছা করে। বাড়ির চারপাশে কম করেও গোটা চল্লিশেক দীর্ঘ দীর্ঘ নারকেল গাছ।

অমিতাভকে দেখে চারটে ঘর থেকেই স্রোতের মতো বিভিন্ন বয়সের নরনারী উঠোনে নেমে এলো। অহেতুক লজ্জা এদের নেই। আছে সারল্য আর আতিথেয়তা। গঙ্গাধরমের মা, দুই কাকা এবং দুই কাকিমা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ষোলো থেকে চব্বিশের মধ্যে ছটি মেয়ে। মেয়েদের প্রত্যেকেরই পরনে লুঙ্গি আর ব্লাউজ। মা এবং কাকিমাদেরও তাই। গঙ্গাধরম সবার সঙ্গে অমিতাভর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার দুই দাদার ফিরতে ফিরতে রাত সেই সাড়ে আটটা-নটা হয়ে যাবে। তবে রাজন ছটার মধ্যেই চলে আসবে।

উঠোনে একটা বড়ো চৌকির ওপর অমিতাভ বসেছিল। ওর চারপাশে ভিড় করেছিল বাড়ির মানুষরা। অতিথিকে সামনে পেয়ে কেউই অখুশি নয়। বছর বাইশ এবং চব্বিশের দুটি মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো ঠেলাঠেলি করছিল নিজেদের মধ্যে। যার বয়স চব্বিশ সে রাজনের দিদি। ল' পড়ছে। ওর নাম করিস্মা। অমিতাভ এখানে এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, কেরালার মানুষদের দেখে বোঝার উপায় নেই কে কতোটা শিক্ষিত —এদের চালচলন অর্থাৎ জীবনযাত্রা এতোই সহজ এবং সাধারণ। সে যখন শুনলো করিস্মা ল' পড়ছে তখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। করিস্মা কিন্তু ইংরেজী বা হিন্দির ধারে কাছে গেল না। পরিষ্কার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'নিঙ্গেলে ওড়ে ভিড়ে এবিড়ে আগন্নু।' এক বর্ণ বুঝতে না পেরে অমিতাভ অসহায়ের হাসি নিয়ে খাঁটি বাংলায় বললো, আমি যদি আমার ভাষায় কথা বলি আপনি বুঝতে পারবেন? কেউ কারো ভাষা না বুঝতে পেরে সহজ হাসিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আপন করে টেনে নিল। গঙ্গাধরম অমিতাভর কানে কানে ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, আমার দিদি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাড়ি কোথায়? অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে করিস্মার দিকে চেয়ে আর একবার হাসি ছড়িয়ে উত্তর দিল, ক্যালকাটা।

গঙ্গাধরমের মা এবং কাকারা কলকাতা সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন-ট্রশ্ন করছিলেন। গ্রামের একেবারে সরল মানুষ। শহর কলকাতার ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। সেই কারণেই অনায়াসেই জিজ্ঞেস করতে পারলেন, কোচিনের থেকে বড়ো না ছোট? সেখানেও কী এতো মানুষ? বোঝাতে গেলে অনেক পরিশ্রম। অমিতাভ শুধু জানালো, কলকাতায় মাটির নিচ দিয়েও ট্রেন চলে। শুনে তো বয়স্ক মানুষ তিনজন হৈ হৈ করে উঠলেন। দক্ষিণ ব্রহ্মপুরম থেকে যাঁরা কোচিন তো দূরের কথা, ত্রিপুনীথুরাতেও ন'মাসে ছ'মাসে একদিন আসেন তাঁদের কাছে ঐ খবরটা অবশ্যই মহা বিস্ময়ের।

গঙ্গাধরমের দুই কাকিমা অমিতাভর জন্য খাবার নিয়ে এলেন। এক থালা উথপম। বাটিতে করে ডাল জাতীয় সম্বর এবং তেঁতুলের চাটনি। অমিতাভ উথপম এর আগে খায়নি। এবারেই প্রথম খেল। খেতে কিন্তু খারাপ লাগলো না। আসলে ওটা তাল আর চালগুঁড়ো দিয়ে তৈরি এক ধরনের পিঠে। সঙ্গে নারকেল মেশানো। আর একটা থালায় দুটো বিশাল কলা।

অমিতাভ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, এতো খাওয়া কি সম্ভব?

দুই কাকিমা উত্তর দিলেন, এটুকু না খেলে আমরা কষ্ট পাবো। আমাদেরও তো একটা তৃপ্তি রয়েছে। এই সময়ে গঙ্গাধরমের মা ওর কানে কানে কি যেন বলতেই গঙ্গাধরম বেশ কিছুটা সোজা এগিয়ে গিয়ে একটা নারকেল গাছের গোড়ায় উপস্থিত হলো। তারপরেই অবিকল একটা কাঠবিড়ালীর মতো তরতরিয়ে বেয়ে একেবারে গাছের মাথায়। এবং মুহূর্তে দুটো ডাব পেড়ে আবার অমিতাভর সামনে। ব্যাপারটা চিন্তা করতে অমিতাভর একটু সময় লাগলো। নারকেল গাছটা না হলেও সত্তর-পঁচাত্তর ফুট উঁচু।

গঙ্গাধরমের এক কাকা বললেন, ওর খাওয়া হোক, তারপরে ডাব দুটো কেটে দিস। আর এক কাকা কাউকে কোনো অর্ডার না দিয়ে নিজেই একটা দা এনে গঙ্গাধরমের হাতে তুলে দিলেন।

এঁদের ছোট ছোট কাজের মধ্যে, সূক্ষ্ম আন্তরিকতার টানটা মনকেও নাড়া দেয়। কে বলবে অমিতাভ আজ এই বাড়িতে প্রথম এসেছে? একজন অপরিচিতকে আপন করে নিতে এঁদের ব্যবহার অপর পক্ষকে সহজেই আপ্লুত করে। তবুও অমিতাভ বললো, এর পরেও ডাব খেতে হবে? এবারে করিশ্মা উত্তর দিল, নয় কেন?

যেহেতু আমার খাওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে আমি খুবই সজাগ।

স্যার, ডাব দুটো আপনাকে খেতেই হবে। গঙ্গাধরম বেশ অনুনয় করেই বললো, কোচিনে ডাবের ইতিহাসটা বোধহয় আপনি জানেন না। শুধু কোচিন কেন—পুরো কেরালা রাজ্যেই একই নিয়ম। এখানে সব জিনিস খাবার সুযোগ পাবেন একমাত্র ঐ ডাব ছাড়া। মেডিকেল স্টোর্স ছাড়া কোথাও ডাব পাবেন না এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থাকলেই আপনি ওটা কিনতে পারবেন।

কারণ?

কেরালার কুটির শিল্প তো বলতে গেলে নারকেলের ছোবড়া থেকেই। দড়ি, পাপোষ, কার্পেট, ব্যাগ, মূর্তি, কী নয়! ডাব পেড়ে তাই ওটাকে নষ্ট করা হয় না।

নষ্ট যখন করেছো, দ্বিতীয়বার আমি ওটাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। অমিতাভ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সরল হেসে বললো, সবার আগে ডাব দুটোকেই খাই, কী বলো?

ডাব নয়—অমিতাভ যেন শরবত খেল। অনেকটা জল আর কী চমৎকার মিষ্টি! সারা শরীরটা এমনিতেই জুড়িয়ে গেল। আহা, কলকাতায় কেন এমন ডাব পাওয়া যায় না! বন্ধুদের গিয়ে বলতে হবে, শিগ্‌গির ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যোগাড় করে শুধুমাত্র ডাব খেতে কোচিনে রওনা দে। বাড়ি ফেরার সময় দু-চারটে গাছ নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু লাগাবে কোথায়? টবে? কলকাতায় মাথা গোঁজার পর শখ-শৌখিনতার প্রশ্নটা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। যার আছে তার কথা অবশ্য আলাদা।

রাজন উঠোনে পা দিয়ে অমিতাভকে দেখতে পেয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম রাজন। অমিতাভ ওর মুখের

দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো। হয়তো নিজের পরিচয়টা দেবার কথাই তার মাথায় ছিল কিন্তু তার আগেই রাজন বললো, আমি আপনাকে চিনি স্যার। কথাটা রাজন খুবই স্বাভাবিক সুরে বলেছে। তবুও অমিতাভর ভেতরটা খচখচ করতে লাগলো। এই চেনার কথাটা বলা কি অন্য অর্থে? হয়তো নয়। আসলে নীতিগতভাবে অমিতাভই দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাজনের জায়গায় সে চাকরি করতে এসেছে—ব্যাপারটা তো এই-রকমই দাঁড়াচ্ছে। রাজনকে একপলকে দেখে নিল আর একবার। ওকে নিয়েই রমন ফার্টিলাইজারে তোলপাড় হচ্ছে। পাদ্মিনী উষা কিছুতেই ছেলেটাকে বঞ্চিত হতে দেবে না। সংগঠনের পুরো ঐক্য নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই রাজনকে কি অমিতাভ সোমবার দিন দেখেছিল? বোধহয় না। অতো মানুষের ভিড়ে তাকে নজরে না পড়লেও তার নামটা শোনা থেকে সে কিন্তু একবারও বধির হয়নি।

অমিতাভ ভাবছিল রাজন কি জিজ্ঞেস করবে কেন সে এই দুদিন অফিসে যায়নি? সেরকম কোনো প্রশ্নই ও তুললো না। পরিষ্কার মনে হলো, অফিসের ব্যাপারটা ও ভুলে থাকতেই চায়। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছো, সুতরাং তুমি এখন অতিথি—এই মনোভাবটাই ওর ভেতরে কাজ করছে। রাজন গঙ্গাধরমের দিকে মুখ ফেরালো। স্যারকে কখন নিয়ে এসেছিস?

এই ঘণ্টাখানেক হবে।

আমাকে আগে বলবি তো, তাহলে একসঙ্গেই আসতাম।

স্যারের আসার ঠিক ছিল না। চুপচাপ শুয়েছিলেন। হঠাৎ রাজি করিয়ে ধরে নিয়ে এসেছি।

ভালোবাসায় ভাঁটা নেই। অতিথি শত হলেও পর, এটা ওরা বুঝতেই দিতে চায় না। গঙ্গাধরমের কাছ থেকে যেটুকু জানার জেনে রাজন বেশ উৎসাহ নিয়েই বললো, স্যার, একবার যখন এসেই পড়েছেন আজকের দিনটা থেকে যান।

সারা বাড়িকে ব্যস্ত করে লাভ আছে কিছু? অমিতাভ তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধের হাসি হাসলো।

আমরা ব্যস্ত হবো এটাই বা ভাবছেন কেন? স্পেশাল কিছুই হবে না। কারিপাতার ডাল ভাত যা আমরা খাব আপনিও তাই খাবেন। রাজন হেসে ফেললো, বরং বলুন আপনারই কষ্ট হবে।

দারুণ বলেছিস তো রাজন! গঙ্গাধরম জুড়ি বাঁধতেই অমিতাভ দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়েই চাপা হাসলো। ছোট্ট করে বললো, উল্টো চাপ! তারপরেই ঘনিষ্ঠ সুরে জানালো, কথা দিলাম অন্য একদিন এসে থাকবো। কিন্তু ভাই আজকে নয়। হোটেলের কাউকে বলে আসিনি। ওরা চিন্তা করবে। তাছাড়া আমাকে আরও কিছু চিঠি লিখতে হবে।

দুই ভাই যখন অমিতাভকে রেখে দিতে ব্যস্ত এবং অমিতাভ যথারীতি থাকতে চাইছে না তখন গঙ্গাধরমের মা নিজের মাতৃভাষায় সাদাসিধে একটা মন্তব্য করলেন, 'নিঙ্গেল নাল্লা মানুষণ আল্লিও।' সবাই হো হো করে হেসে উঠতেই অমিতাভ চোখের তারা ঘুরিয়ে জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি? এতো হাসি কীসের?

মা বলছেন আপনি ভালো মানুষ নন।

তাই নাকি? অমিতাভ আবেগভরে হাসতে লাগলো। আমি আজ না থেকেও প্রমাণ করে দেবো আমি খুবই ভালো মানুষ।

অমিতাভকে বাস স্টপেজ পর্যন্ত পেঁছে দিতে রাজন এবং গঙ্গাধরম দুজনেই ওর সঙ্গ নিল। বাড়ির মানুষরা আবার ওকে ঘিরে ধরে বারবার যে কথাটা বলতে লাগলো তা হলো, আর যেন নিমন্ত্রণ করে আনতে না হয়। আবার এসো। অমিতাভ প্রথম-বারে একটা ভুল করেছিল। ফেরার সময় সেটার সংশোধন করে নিল। গঙ্গাধরমের মা, দুই কাকা এবং কাকিমাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিজেকে এই বাড়িরই একজন বলে মনে করিয়ে দিল।

বাস থেকে নেমে যে রাস্তায় ওরা এসেছিল এবারে অন্য রাস্তা ধরলো। কাজুবাদামের বনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ ব্রহ্মপুরমের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে সোজা পশ্চিমের দিকে চলে গেছে,

ওরা সেই পথেই পা বাড়ালো। গল্প করতে করতে ওরা কখন যে বাস স্টপেজে পেঁাছে গেল, খুব একটা টের পাওয়া গেল না। অথচ সময় সেই একই লাগলো প্রায়। উনিশ মিনিট।

আমরা কি এই স্টপেজে নেমেছিলাম? চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে অমিতাভর মনে হলো এটা নতুন জায়গা। এখানে বেশ কয়েকটা দোকান গায়ে গা লাগিয়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে। খদ্দেরদের ভিড়ও কম নয়। দু-চারটে পাকাবাড়িও মাথা উঁচু করে রয়েছে। রাস্তায় লোকের যাতায়াতের সঙ্গে সাইকেল আরোহীর চলমান ছবিটা যেন মালায় সুতো গেঁথে চলেছে।

না, স্যার। গঙ্গাধরম উত্তর দিল, এখান থেকে আরও দুটো স্টপেজ পর ঐ স্টপেজটা। আমরা আসার সময় গ্রামের সামনে দিয়ে এসেছিলাম। এটা পেছন দিকের রাস্তা। গঙ্গাধরম আর কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, রাজন ওকে থামিয়ে দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ সুরে হঠাৎ বললো, স্যার, দূরের ঐ দোতলা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন? ঐ যে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ।

ঐ বাড়িটা যোশেফ দিনকরণের। আপনি ওকে চেনেন স্যার?

যোশেফ দি-ন-ক-র-ণ! অমিতাভ মনে করতে গিয়েই এক-ঝলকে বল-পায়ে দুরন্ত এক খেলোয়াড়ের ছবি ভেসে উঠলো। সে এবারে বেশ আগ্রহ নিয়ে বললো, আমাদের কলকাতায় এক বড়ো ক্লাবে যে ছেলেটা ফুটবল খেলে?

হ্যাঁ, স্যার।

আমি কেন, সারা ভারতবর্ষই তো ওকে চেনে!

আপনি ঠিকই বলেছেন। রাজনের চোখে-মুখে গর্বের ঘন ছায়া। চার বছর আগেও স্যার ওখানে একটা কুঁড়েঘর ছিল। আর আজকের ছবিটা তো নিজের চোখেই দেখতে পারছেন। আমার বলা র উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয়।

তবে? অমিতাভ রাজনের মুখের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলো।

ছোটবেলায় যোশেফ দিনকরণ পড়াশুনা করার সুযোগই পায়নি। একবেলাতেই যার পেট ভরে খাওয়া জুটতো না লেখা-পড়া শেখাটা তার কাছে চিন্তারও বাইরে ছিল। ক্লাস ফোরে ওঠার পর তাই চিরতরেই ওটা বন্ধ হয়ে গেল শুধুমাত্র অভাব আর দারিদ্র্যের জন্য। অথচ আগ্রহ ছিল। সেই দিনকরণের এখন অভাব বলে কিছু নেই। দারিদ্র্য শব্দটা তার জীবনের অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন। কলকাতায় ফুটবল খেলে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে। এটাও কিন্তু স্যার আসল খবর নয়। রাজনের সারা মুখে স্বর্গের হাসি লেগে রয়েছে।

তাহলে? অমিতাভর বিস্ময় বাড়ছিল।

ওর বাড়ির একতলায় বিরাট একটা হলঘর আছে। ঐ ঘরটা কি জানেন? টেক্সট বুক লাইব্রেরি। এলাকার দুঃস্থ গরীব ছেলেমেয়েরা এসে ওখানে পড়াশুনা করে। সিলেবাস অনুযায়ী দিনকরণ প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক কিনে দেয় ঐ ছেলেমেয়েদেরই দেওয়া বুকলিস্ট দেখে। ক্লাস ওয়ান থেকে এম এ ক্লাসের বই পর্যন্ত পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার স্যার। দিনকরণ তো সারা বছরই ফুটবল খেলে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে দু-চার দিনের জন্য বাড়ি আসে। ও কি বলে জানেন? 'বাড়িতে ঢোকার মুখে যখন দেখি এতোগুলো ছেলেমেয়ের দল গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করছে তখন ভাবি শুধু ওরা নয়—ওদের সঙ্গে আমিও পড়ছি।

বাসের পুরো রাস্তাটা অমিতাভ শুধু দিনকরণের কথাই ভাবতে ভাবতে এলো। ইনকাম তো অনেকেই করে কিন্তু এমন মহান ইনকাম ক'জনে করে? সাতাশ বছরের ঐ খেলোয়াড়টির পায়ে শ্রদ্ধায় মাথা রাখতে ইচ্ছে করছিল। অমিতাভ কলকাতায় গিয়ে ওর সঙ্গে অতি অবশ্যই আলাপ করবে। বলবে, আমি তোমার বাড়ি দেখে এসেছি। না-না, বাড়ি নয়—পাঠমন্দির! হঠাৎ কনডাক্টরের আওয়াজটা ওর কানে গেল। ত্রিপুনীথুরা—ত্রিপুনীথুরা।

বাসটায় মোটামুটি ভিড় ছিল। অমিতাভ বসেছিল মাঝখানে। আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে যতোদূর সম্ভব দাঁড়ানো যাত্রীদের কম ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়েছে। নেমে দু-পা এগোতেই একেবারে মুখোমুখি হলো পদ্মিনীর। ওর সঙ্গে আগের দিনের দেখা সেই ভদ্রমহিলা। অমিতাভ কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। ওকে অস্বীকার করে এড়িয়ে যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু ব্যাপার। আবার নিজের থেকে এগিয়ে কথা বলাটাও অন্য অর্থ বহন করবে। বিশেষ করে তাকে কেন্দ্র করেই যখন জলটা ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে।

পদ্মিনী অমিতাভকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই দুদিন ও অফিসে আসেনি। পদ্মিনী নিশ্চিত ম্যানেজমেণ্টই ওকে আসতে দেয়নি। ওদের হাজারো চালাকির মধ্যে এই গর-হাজির থাকার ব্যাপারটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মিঃ নামবিয়ার পরে প্রমাণ করবেন, শ্রমিক কর্মচারীরা মারধর করার হুমকি দিয়েছে। অমিতাভ তাই এই দুদিন আসেনি। আবার এটাও বলতে পারেন, ইউনিয়নই তো ওকে সাইটে ঢুকতে দিতে আপত্তি জানিয়েছে। আমরা সংঘাত এড়িয়ে গেছি। অর্থাৎ অবস্থা যেদিকেই গড়াক না কেন, ওরা ফায়দা তোলার চেষ্টা করবেন।

হ্যাঁ, পদ্মিনী এটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, 'রাজনের মীমাংসা না হলে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অফিসে ঢুকতে দেবো না।' তা ম্যানেজমেণ্ট কি তার সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে? এই কথাটা বাধ্য ছেলের মতো শুনলো, অন্যগুলো নয় কেন? তার মানে এটাই প্রমাণ করছে এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরা অনেকদূর খেলবে। পদ্মিনী এতো সহজে ওদেরকে এগিয়ে যাবার জন্য কার্পেট বিছিয়ে দিতে পারবে না।

এই না আসার ব্যাপার নিয়ে পদ্মিনী আর একটা কথাও ভেবেছিল। অমিতাভর তো অসুখ-বিসুখও করতে পারে। নতুন আবহাওয়ায় এসে সেটা হতেই পারে। সেই কারণেও না আসতে পারে। তেমনটা হলে অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। আসলে

পদ্মিনীকে তীক্ষ্ন নজর রাখতে হয় ম্যানেজমেণ্টের প্রতিটা কাজের ওপর। আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে খুবই স্বাভাবিক এবং শান্ত ব্যাপার বলে মনে হয়, পরবর্তী সময় সেটাই হয়তো ধারালো হয়ে ওঠে। সুতরাং চারদিক দেখেশুনে টিপে টিপে পা ফেলা উচিত। পদ্মিনী সৌজন্য প্রকাশ করলো, আপনার খবর কী ?

আমার খবর তো আমি নিজেই জানি না।

কি রকম ?

মিঃ নামবিয়ার জানালেন দুদিন অফিসে আসবে না—গেলাম না। কাল থেকে আবার যেতে বলেছেন, যাবো।

পদ্মিনী অমিতাভর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ছেলেটা সত্যিই সরল। যে কথাগুলো তাকে বলার নয়, কতো অনায়াসেই তা বলে ফেললো। অমিতাভ তো ইচ্ছে করলেই চেপে যেতে পারতো কিন্তু সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। ঠিক ঠিক যেটা ঘটেছে সেটা বলতেই তার আগ্রহ। পদ্মিনী এবারে অন্যরকম একটু ভাবলো। অমিতাভ তাকে বলবে নাই বা কেন? সে তো ম্যানেজমেণ্টের পেটোয়া লোক নয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মেলালে সে এসব কথা বলতোই না। তাছাড়া নিজেকে সন্দেহের যথেষ্ট ঊর্ধ্বে রেখে ইউনিয়ন অফিসে তো অমিতাভ সব কথাই খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে। সেদিক দিয়ে ও সহযোগিতাই করেছে। অফিস আর ইউনিয়নের কথা ভাবতে গিয়ে পদ্মিনীর হঠাৎ খেয়াল হলো তার সঙ্গে তার মা রয়েছেন। এবং অমিতাভর সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা তারই কর্তব্য।

পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতেই অনসূয়া স্নেহের সুরে বললেন, পথের মধ্যেই প্রণাম করলে মিষ্টিমুখ করাবো কি করে ? পরিষ্কার বাংলা কথা। অনসূয়া যেন নিজের মাতৃভাষাতেই বললেন। অমিতাভ তাই বেশ অবাক হয়েই ও'র মুখের দিকে তাকালো। ব্যাপারটা ভাবতে ওর ভালোই লাগছে। কোচিনের একজন ভদ্রমহিলা বাঙালীর মতোই বাংলা বলছেন। অমিতাভ তাই বলেই ফেললো, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন !

মা এবং মেয়ে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসলেন। তবে অনসূয়ার হাসির গভীরতাটাই বেশি। অমিতাভর কথা শুনে তিনি যেন বেশ মজা পেয়েছেন। শেষে বলেই ফেললেন, আসলে আমি তো বাঙালীই। ওর বাবাকে বিয়ের পর এখন পুরোপুরি কেরালিয়ান হয়ে গেছি বলতে পারো। তাই বলে নিজের ভাষাটা কি ভোলা যায় ?

আপনি বাংলা বলতে পারেন ? অমিতাভ ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ পদ্মিনীকে প্রশ্ন করে বসলো।

বুঝতে পারি। পদ্মিনী মৃদু হেসে উত্তর দিল, তেমন বলতে পারি না।

পারা উচিত ছিল। অতি অনায়াসে আদেশ দেবার ভঙ্গিতে কথাটা বলার পর অমিতাভ যখন বুঝতে পারলো এতোটা জোর দিয়ে তার বলাটা ঠিক হয়নি তখনই সে আবার নরম হলো, অবশ্য কোন ভাষাটা শিখবেন না শিখবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

আগের ধমকটা তো ভালো ছিল। পদ্মিনীর কৌতূহলী প্রশ্ন, সংশোধন করলেন কেন ?

আমি না আপনাকে খুব সাধারণ একজন মনে করেছিলাম।

এখন কি অন্য কিছু ভাবছেন ?

আমারই ধমক খাওয়ার সময় হয়েছে। আপনাকে উচিত অনুচিত শেখাচ্ছি।

ঐ জিনিসটা সকলেরই শেখার আছে। অনসূয়া হাসতে হাসতে বললেন, এই দেখো না রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ কথা বলা কি আমাদের উচিত হয়েছে ? তোমাকে অনেক আগেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তারপরেই মেয়ের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট মন্তব্য করলেন, এই কাজটা তোরই ছিল।

অনসূয়ার কথা শুনে অমিতাভ পদ্মিনীর চোখের দিকে তাকালো। পদ্মিনী তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। মাকে একবার দেখে নিয়ে আড়চোখে ওর দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই এক ঝলকের

চোখাচোখি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল সে। এর পরেও আর কতোক্ষণ চুপচাপ থাকা যায়? অমিতাভকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে ওর বিরোধিতা করা যাবে না এমন দুর্বল মেয়ে পদ্মিনী নয়। ওটা অফিসের ব্যাপার। সেখানে নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া বাড়িটা নিশ্চয়ই সমাধানের কেন্দ্র নয়। যখনকার যে ভূমিকা—মানুষকে তো সেইভাবেই চলতে হবে। সব যুক্তিই তো পদ্মিনী একে একে দাঁড় করালো তবুও যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মা তাকে খুব মুশকিলেই ফেলে দিলেন। ঐ অবস্থা থেকে অমিতাভই ওকে উদ্ধার করলো। সে অনসুয়ার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বললো, আজ থাক। অন্য একদিন যাবো।

আজ যখন যেতে চাইছো না তখন অন্যদিনও আর যাবে না!

তা কেন? অমিতাভ সামান্য হাসলো।

সেটা তো আজও হতে পারে? তারপরেই মেয়ের দিকে আর এক প্রস্থ চোখ বুলিয়ে বললেন, তুই হঠাৎ ভদ্রতায় এতো কৃপণ হয়ে উঠলি কেন? ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অমিতাভ তো তোরই কলীগ।

পদ্মিনী আজ পর্যন্ত মায়ের কাছে কোনো ব্যাপার লুকিয়ে রাখেনি। বন্ধুর মতো সব কথাই তাঁকে বলা চাই। অফিসের তুচ্ছ একটা ঘটনাও তাই অনসুয়ার অজানা নয়। 'কি রে, আজ তোর অফিসের খবর কি?' মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে পদ্মিনী এতোদিন পুরো রিপোর্ট'ই দিয়ে এসেছে। দেওয়ার কারণও রয়েছে। সে বাড়িতে থাকুক বা না থাকুক—সংগঠনের কাজে অনেক সময় অনেকেই বাড়িতে এসে জানিয়ে যান, এই খবরটা পদ্মিনীজীকে দিয়ে দেবেন। সেই কারণে মাকে সড়গড় রাখতেই হয়। পুরো ব্যাপারটা জানা থাকলে তিনিও যাতে কিছু কিছু উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু এইবারই প্রথম সে অমিতাভর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেছে। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে পদ্মিনী হয়তো সঠিক উত্তরও দিতে পারবে না। সে যাই হোক, এই মুহূর্তে তার একটাই চিন্তা, মাকে জানিয়ে রাখলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির

মধ্যে তাকে পড়তে হতো না। কিন্তু ওটা তো আফশোসের কথা। ম্যানেজমেণ্টের জটিল জটিল চালকে সে ভেস্তে দেয়, এখন নিজেই ভেস্তে গেল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, পদ্মিনী কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। একটা অস্থিরতা ওকে ঘিরেই রয়েছে। চোখে মুখেও তারই ছাপ।

ও'র হয়তো অসুবিধে রয়েছে। অমিতাভ পদ্মিনীকে আর একবার বাঁচাবার চেষ্টা করলো।

ওর আবার কিসের অসুবিধে? অনসূয়া অবাক হলেন। তাছাড়া তুমি আমাদের বাড়ি যাবে। সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে? অনসূয়া আক্ষেপ করে বললেন, আমার মাথাটা অতো পরিষ্কার নয় যে তোমাদের বিষয়টা জলের মতো বুঝতে পারবো। পদ্মিনী যেতে বলছে না—তুমিও খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছো না।

না-না, পদ্মিনীজীর না বলার কি আছে? অমিতাভ খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, বিশ্বাস করুন আসলে অসুবিধেটা আমারই। আমি অনেক দূর থেকে এইমাত্র ফিরলাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান করে এখন শুধু ঘুমাতে ইচ্ছা করছে।

পরে একদিন যাবে তো?

নিশ্চয়ই।

এসো কিন্তু—

আসবো। অমিতাভ নতুন করে আর একবার প্রণাম করতেই অনসূয়া বললেন, বারবার প্রণাম করতে হবে না। তুমি বড়ো হও। চাকরিতে উন্নতি করো—তোমাকে আমি এমনিতেই আশীর্বাদ করছি।

হোটেল বালসাম্মাতে ফিরে এসে অমিতাভ স্নানটান করে সত্যি সত্যিই বিছানায় দেহটা ছেড়ে দিল। সারা দিনের এতো ঘটনার মধ্যে তার মাথায় ঐ একটা জিনিসই ঘুরছে, দিনকরণের পাঠমন্দির। লেখাপড়াকে এমনভাবে ভালোবাসতে আর কেউ পেরেছে বলে

অমিতাভর জানা নেই। এই সঙ্গে রাজনকেও চমৎকার লাগলো। ঐ ছেলেটা তো পরিষ্কার জানে, তার প্রমোশন বন্ধ করতেই ম্যানেজমেণ্ট সুদূর কলকাতা থেকে অমিতাভকে এখানে নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও কী সুন্দর বন্ধুর মতো ব্যবহার করলো! অমিতাভর বিন্দুমাত্র দোষ নেই। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওসব যুক্তি-টুক্তির ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না। টোটাল ব্যাপারটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও রাজন কি অপরিসীম সংযমের পরিচয়ই না দিল! এটা ঠিক এর পেছনে পদ্মিনী ঊষার ভূমিকা রয়েছে। তাহলেও রাজনের উদারতাকে ছোট করে দেখা যায় না।

পরদিন অফিসে গিয়ে অমিতাভ অন্য কোথাও ঢুকলো না। বড়ো বড়ো সাহেব অর্থাৎ মিঃ নামবিয়ার, পার্সোনেল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণান, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই এবং কোম্পানীর সেক্রেটারি মিঃ ফিলিপস কারো সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলো না। সে সোজা তোশিবা জেকবের ঘরে ঢুকে কোণের দিকে একটা চেয়ার দেখে চুপচাপ বসে রইলো।

গুড মর্নিং। ফোলা ফোলা ঠোঁটে আদুরে গলায় মিসেস জেকব ছোট্ট সম্ভাষণ করতেই অমিতাভও প্রতি উত্তর দিল কিন্তু তার মাথায় অন্যরকম ভাবনা এলো। তার মতো একজন বিতর্কিত জুনিয়ার ক্লার্ককে এতোটা প্রাধান্য দেওয়ার কি আছে? এসবও কি মিঃ নামবিয়ারের নির্দেশে? স্বাভাবিক নিয়মে সে এখানে এলে ম্যানেজিং ডিরেকটরের পি এ মিসেস জেকব তাকে এই ধরনের খাতিরই করতো না। কর্তৃপক্ষের কোন অজানা উদ্দেশ্যর ছককাটা ঘরের গহ্বরে সে ঢুকছে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

ব্যাপারটা বোঝা গেল একটু পরেই। মিসেস জেকব আগের মতোই আদুরে গলায় বললো, প্রথম দিন আপনি যেখানে বসে-ছিলেন ঐ চেয়ারে গিয়েই বসবেন। আপনাকে আজ ফাইলপত্র দেওয়া হবে। কিছু কাজকর্মও করবেন।

করতেই হবে? ভুরু দুটো আর টানটান রইলো না অমিতাভর।

সাহেব তেমন নির্দেশই দিয়েছেন।

পারলাম না। অমিতাভ ছোট্ট দুটো কথায় তার সমস্ত বিরক্তি প্রকাশ করলো।

সেটা সাহেবকে গিয়ে বলুন। তোশিবা জেকব আগে যেমন-ভাবে হেসে হেসে কথা বলছিল এবারেও ঠিক সেই হাসিটিই বজায় রাখলো। তবে এমন স্পষ্টভাবে 'না' শুনে তার বেশ আশ্চর্যই লাগলো।

এম ডি'র ঘর থেকে ঘুরে এসে তোশিবা নিজের আসনে বসতে বসতে বললো, সাহেব আপনাকে ডাকছেন। নিঃশব্দের প্রহর কাটলো কিছুক্ষণ। সম্ভবত কি কি উত্তর দেবে অমিতাভ সেটাই একবার ভেবে নিল। পরে নীরব এক দৃষ্টিতে তোশিবাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এম ডি'র ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

আসবো স্যার ?

এসো অমিতাভ। নামবিয়ার সাহেব একটুও উত্তেজিত নন। বরং আরও বেশি নরম গলায় বললেন বোসো—

অমিতাভ সামনের একটা চেয়ারে বসতেই তিনি শান্ত দৃষ্টিতে ওকে বোধহয় জরীপ করতে লাগলেন। ওর এই বিদ্রোহের পেছনে পদ্মিনী ঊষার কোনোরকম উস্কানি রয়েছে কিনা সেটাও একবার বোঝা দরকার। উদার এক ভঙ্গিতে মিঃ নামবিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হলো কি ?

কিছুই না স্যার।

তাহলে নিজের সিটে যেতে চাইছো না কেন ?

আপনি তো জানেন ওখানে গেলেই বিশ্রী একটা সিন ক্রিয়েট হবে। অমিতাভ ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগলো। কী কৌশলেই না তাকে প্রশ্ন করা হলো, নিজের সিটে যেতে চাইছো না কেন ?' এর অর্থই হলো এখন থেকেই তার মাথায় অভিযোগের বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া। অথচ নামবিয়ার সাহেব খুব ভালো করেই জানেন, ওখানে যাওয়াটা কি অমিতাভর ইচ্ছায় ? উনি আগে কাজের পরিবেশটা তৈরি করে দিন। তখন না যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ যা ব্যাপার-স্যাপার চলছে, অমিতাভ দুদিকেই ফেঁসে

যাবে। তবুও সে সংযত থেকে বললো, ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে?

তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন? নামবিয়ার সাহেব অভয় দিয়ে বললেন, আমি তো রয়েছি। তাছাড়া তুমি তোমার সিটে যাবে, ওরা কি করবে?

'ওরা কি করবে' সেটা মিঃ নামবিয়ার বেশ ভালো করেই জানেন। কিন্তু সে কথা বলে ও'কে বিব্রত করা যাবে না। ও'র নিশ্চয়ই আজ বোধহয় কোনো মতলব আছে। সে থাক। নতুন করে অমিতাভর আর কিছুই হারাবার নেই। কাজেই সে কথার কচকচির মধ্যে ঢুকতে চাইলো না। অমিতাভ জানে যে চেয়ারে গিয়ে সে বসবে ওটা তার আসন নয়—বধ্যভূমি। মানসিক সেই প্রস্তুতি নিয়েই অমিতাভ আস্তে আস্তে এম. ডি'র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জানা ব্যাপারটাই ঘটলো। অমিতাভ সেকশানে ঢুকে চেয়ারে বসতে না বসতেই সবাই যে যার আসন ছেড়ে ওকে এসে ঘিরে ধরলো। শশীকান্ত নামের সেই ছেলেটি নিজেই পাশের সেকশানে ছুটলো পদ্মিনীকে খবর দিতে। পদ্মিনী যখন এলো ওর পেছনে তখন আরও শ চারেক লোকের মিছিল। মালয়লম ভাষায় ওরা নিজেদের মধ্যে খুবই উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে। অমিতাভ এটুকু বুঝতে পারছে ঐ কথাগুলো ম্যানেজমেণ্টের বিপক্ষেই বলা হচ্ছে। কেননা তার গায়ে কেউ একটু আঁচড়ও বসায়নি এবং সামান্য একটা বাজে কথাও নয়।

দেখতে দেখতে ঐ জায়গাটা এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনেটা মানুষের মাথায় মাথায় ভরে গেল। নিভৃত এক নির্দেশে অফিসের সব কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে জড়ো হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সেকশানের ঐ বিশাল জনতা অমিতাভকে সঙ্গে করে নিচে নেমে গেলেন। তিনতলা অফিসের প্রতিটা ঘর তখন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। বিল্ডিং-এর সামনেটা সেই সময় জনসমুদ্র।

রাজন অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল। দূর থেকে আসতে

আসতেই ঐ জনসমাবেশটা তার চোখের ফ্রেমে আটকে গেল। গণ্ডগোলটা বিরাট আকার নিতে চলেছে মনে করে সে একটু তাড়াতাড়িই পা চালালো। কাছাকাছি এসে যখন জানতে পারলো জনতা অমিতাভকেই ঘিরে রয়েছে, স্বাভাবিক কারণেই সে তখন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। অতো লোককে সামলানো সহজ নয়। উত্তেজনার বশে কে কখন কি করে বসে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সব চেয়ে বড়ো কথা, অমিতাভকে কেন ঘিরে রাখা হবে? উনি কি চোর যে এভাবে ওঁকে অপমান করা হবে? রাজনের নিশ্চিন্ত ধারণা পদ্মিনীজী ধারে-কাছে নেই। তিনি আসল লোকগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ঝুটমুট অমিতাভকে নিয়ে এই ধরনের ছেলেমানুষি করবেন না। নানা রকমের চিন্তাভাবনা করতে করতে রাজন ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগোতে লাগলো।

অমিতাভ কার্যত বন্দী হয়েই ছিল। আজকের এই ব্যাপারটায় তার খুবই খারাপ লাগছে। মিঃ নামবিয়ার এই কাজটা ইচ্ছে করেই করলেন। নিজে ঠাণ্ডা ঘরে বসে জনতার রোষের মুখে তাকে ঠেলে দিয়ে নতুন আবার কি প্ল্যান করছেন তিনিই জানেন। অমিতাভর আরও খারাপ লাগছে, শুধু খারাপ নয়—অসহায়বোধ করছে অনেকক্ষণ ধরে পদ্মিনীকে দেখতে পাচ্ছে না বলে। সে সামনে থাকলে নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় কাটাতে হয় না। জনতা যখন অফিসের দোতলা থেকে তাকে নিয়ে নিচে নেমে এলো, 'এখানে নয়, নিচে চলুন' বলতে বলতে, সেই সময়েও পদ্মিনী ওখানে ছিল না। অতো ভিড়ের মধ্যে সবদিক খেয়াল রাখা সম্ভব ছিল না। শশীকান্ত পদ্মিনীকে ডাকতে গিয়েছিল। পদ্মিনীও ছুটে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। অমিতাভর সঙেগ একবার চোখাচোখিও হলো। ভিড় তখন জমজমাট। চিৎকার চেঁচামেচি চারদিকে। তারপর থেকেই অমিতাভ আর ওকে দেখেনি। খুব সম্ভব পদ্মিনী শশীকান্ত এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে সাহেবদের কাচের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে থাকতে পারে।

রাজনকে সামনে দেখে অমিতাভ নতুন করে নিঃশ্বাস নিল। যদিও তার সারা মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া তবুও সে যেন কিছুটা

রিলিফ পেল। রাজনের কানের কাছে মুখ এনে অমিতাভ ধীর গলাতেই বললো, অনেকক্ষণ ধরে পদ্মিনীজীকে দেখছি না। অনুগ্রহ করে আপনি একবার ও'র খোঁজ করবেন?

অনুগ্রহ করার প্রশ্ন উঠছে কেন স্যার? রাজন বেশ দুঃখ নিয়েই বললো, আপনার এই কথাটা তো আমার এমনিতেই শোনা উচিত।

মরুভূমিতে এক গ্লাস জল পাওয়ার মতো মানসিকতা তখন অমিতাভর। সে কৃতজ্ঞতার চোখে রাজনের দিকে চেয়ে বললো, ঐ কথার ওপর আমার আর কিছু বলার নেই। আপনি ও'কে একবার ডেকে দিন।

পদ্মিনী বেশ কিছু লোককে নিয়ে গিয়েছিল তোশিবা জেকবের ঘরে। তার প্রথম কথাটাই ছিল, মিঃ নাম্বিয়রের সঙ্গে আমরা এক্ষুণি একটা আলোচনায় বসতে চাই।

তা কি করে সম্ভব? এম. ডি'র পি এ হিসেবে তোশিবা জেকব নিজেকেও বোধহয় আধা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাবে। হয়তো তার ট্রেনিংটাও ঐভাবেই হয়েছে। সে সহজ সুরে বলতে লাগলো, সাহেবের আজকের যা প্রোগ্রাম তাতে পাঁচ মিনিট সময়ও বের করা খুবই কঠিন। আমি বরং আপনাদের কথাটা সাহেবকে জানিয়ে রাখি। উনি যেদিন সময় দেবেন সেই মতো আমিও জানিয়ে দেবো।

যেদিন সময় দেবেন মানে? পদ্মিনী ভুরু কুঁচকে তাকালো।

অন্তত আজকে কোনো উপায় নেই।

তাহলে জোর করেই ও'র ঘরে ঢুকতে হবে—কী বলেন?

কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তোশিবা আলতো হেসে বললো, আমার নির্দেশের ওপর নিশ্চয়ই আপনার কিছু করা না করা নির্ভর করে না। আমার ওপর যেমন আদেশ ছিল –

ওসব আদেশ-টাদেশ ছাড়ুন। শশীকান্ত একটু উগ্র হলো। আপনি এতো পাঁয়তারা করছেন কেন? আপনার কাজ হলো ও'কে গিয়ে খবরটা দেওয়া। এখন সেটাই করুন।

মিঃ শশীকান্ত, আপনি আর একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন।

এই অবস্থায় এর চেয়ে ভদ্রভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং আরও নিচের দিকে নামতে পারি।

কী বলতে চাইছেন আপনি? আপনারা যা খুশি তাই বলে যাবেন, আমাকেও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? আমিও তো চাকরি করতেই এসেছি।

পেছন থেকে কে যেন একজন আওয়াজ দিল, আপনি সাহেবের শেখানো বুলির ড্রাম বাজাতে এসেছেন।

তোশিবা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, সেটা করারও ক্ষমতা থাকা দরকার।

পদ্মিনী বুঝতে পারছে তোশিবা জেকব সুকৌশলে তাদেরকে উত্তেজিত করার আন্তরিক চেষ্টায় আছে। নয়তো এতো উঁচু গলায় কথা বলার সাহস এর আগে তার আর কখনও হয়নি। খুঁটিতে সুতো বেঁধে রেখেই সে এই কাজে নেমেছে। পদ্মিনী তাই সবাইকে শান্ত হবার ইঙ্গিত জানিয়ে তোশিবাকে বললো, আপনি মিছিমিছি অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। কাজের কথায় আসুন —পদ্মিনী এবারে প্রায় আদেশ দেবার সুরেই বললো, আপনি এম. ডি'র ঘরে যান। গিয়ে বলুন ইউনিয়ন মিটিংয়ে বসতে চাইছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক মিনিটের মতো সময় নিয়ে তোশিবা কি যেন একটু ভাবলো। তারপরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। বললো, সাহেব আপনাদের আধঘণ্টা পরে ডাকবেন।

পদ্মিনী যখন তোশিবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল রাজন ওকে দেখতে পেয়েই জোর পায়ে ছুটে গেল। সে হাঁপাচ্ছিল। বললো, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম!

কি ব্যাপার?

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে খুঁজছিলেন।

উনি কোথায়?

ওঁকে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে সবাই ঘিরে রয়েছেন।

কী আশ্চর্য ! অমিতাভ ওখানে গেলেন কি করে ? পদ্মিনী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে শশীকান্তর দিকে চেয়ে বললো, ওঁরা তো দোতলার ঘরে ছিলেন। 'আমরা আসছি' বলে তোশিবা জেকবের ঘরের দিকে তখন চলে গেলাম। এরপরে কারা ওঁকে নিচে নিয়ে গেলেন ? এটা একটা আন্দোলন। কারো খেয়াল-খুশি মতো মনগড়া কাজের জায়গা এটা নয়। যাঁরা ওঁকে নিয়ে গেছেন তাঁরা কি এর বিপজ্জনক দিকটা একবারও ভেবে দেখেছেন ?

পদ্মিনী সময় নষ্ট করছিল না। হাঁটতে হাঁটতে বলেই যাচ্ছিলো, এই ধরনের ভুলের জন্যই ম্যানেজমেণ্ট ওৎ পেতে থাকে এবং পুরোপুরি এর ফসল তুলে নেয়। আজ যদি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ···পদ্মিনী কথাটা বলতে বলতেই মাঝপথে থেমে গেল। আমরা অবশ্য তেমনটা কেউই চাই না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের লাভ এতেই। সবার আগে এই জিনিসটা বোঝা দরকার। আমরা নিজেদের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে মনে করি। এই কি তার নমুনা ?

শেষের দিকে পদ্মিনী ঝড়ের গতিতে পা চালিয়ে ঐ জনতার অরণ্যে পেঁছাতেই সবাই ওকে রাস্তা করে দিল। আর একটু এগিয়েই সে অমিতাভকে দেখতে পেল। ছেলেটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। এমন ফ্যাকাশে মুখ পদ্মিনী এর আগে দেখেনি। এতোগুলো মানুষের ঘিরে থাকাটাই তো একটা মানসিক অত্যাচার। হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর সামনে অফিসের সমস্ত কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে জমায়েত হবেন এইটুকুই নির্দেশ ছিল। উৎসাহের আর এক ধাপ এগিয়ে অমিতাভকে এখানে টেনে আনার কাজটা কে করলো ? ঠিক এই মুহূর্তে সেটা খতিয়ে দেখার সময় এবং সুযোগ কোনোটাই নেই। তাদের সামনে এখন সমস্যার পাহাড়। ওটাকে না ভেঙে আগেই শাখা-প্রশাখা ধরনের কোনো ডালে গিয়ে আসল কাণ্ডে পেঁছানোর পথ থেকে সে সরে আসতে চাইলো না। ঐ ব্যাপারটা আপাতত তোলা থাক।

পদ্মিনী একেবারে কাছে এসে অমিতাভর চোখের দিকে তাকালো। ছেলেটার দুই চোখে আতঙ্কের গভীর ছায়া। এতোক্ষণ

না জানি কী অপরিসীম আশঙ্কা নিয়ে সে সময় কাটিয়েছে। পদ্মিনীর খুব খারাপ লাগছিল! সে তখন ভুগছে এক অপরাধ-বোধে। সেই লজ্জাতেই অমিতাভর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। বিষণ্ণ গলায় বললো, আপনি কিছু বলবেন?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালো অমিতাভ। কিন্তু চারপাশের বিপুল সমাবেশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পদ্মিনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, এখন থাক। ইউনিয়ন অফিসে গিয়েই বলবেন। তার আগে মিনিট পাঁচেক একটু অপেক্ষা করুন।

অমিতাভর সঙ্গে কথা শেষ করেই পদ্মিনী সামান্য উঁচু মতো একটা ছোট্ট ডায়াসে উঠে কর্মচারীদের উদ্দেশে বলা শুরু করলো: ম্যানেজমেন্টের অসহযোগিতার দরুন আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি এবং এটাও ঠিক করেছি রাজনের ব্যাপারে সম্মানজনক নিষ্পত্তি না হলে এই আন্দোলন চলবে। কর্তৃপক্ষ একের পর এক বাহানা করে সময় নিয়ে চলেছে। যেমন বলছে আগামী সপ্তাহে বোম্বাইয়ে বোর্ড মিটিং-এ রাজনের কথা তুলবে। তুলবে — ফয়সালা করে আনবেই এমন কথা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলছে না। অথচ বিষয়টা বোম্বাইয়ে টেনে নিয়ে যাবার মতো এমন কিছু সিরিয়াস নয়। এটা মিঃ নামবিয়ার চোখ বুজে এখানেই করে দিতে পারেন। সেই তিনিও এখন আমাদের বোম্বাই দেখাচ্ছেন। এরপরে বলবেন সামনেই 'ওনম' উৎসব। তিন-চার দিন তো এমনিতেই অফিস ছুটি থাকবে। সুতরাং আরও সময় নিয়ে এক অবহেলার খেলা খেলবেন আমাদের সঙ্গে। বারবার এই জিনিস চলতে পারে না। আর আধ ঘণ্টা বাদে আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। আমরা সেখানে একটা কথাই পরিষ্কার করে বলবো, আমরা কোনো অন্যায় আব্দার করিনি। সেই সঙ্গে আমাদেরও শান্তি এবং শৃঙ্খলার নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমাদের তো আছেই একমাত্র শৃঙ্খলা। এটুকু বজায় রাখতেই হবে।

এরপরে পদ্মিনী যে কথাটা বললো—সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একমাত্র সে-ই বলতে পারে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে পদ্মিনী স্পষ্ট গলায় বলতে লাগলো ঃ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ম্যানেজমেণ্ট আড়ালে অন্য রকম খেলায় ব্যস্ত। আমরা তাই ও'কে কাজে যোগ দিতে নিশ্চয়ই বাধা দেবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ঘিরে বসে থাকবো। যাঁরা ও'কে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁরা ঠিক কাজ করেননি। আমাদের কোনো গোপন ব্যাপার নেই। আমাদের ভুল-ত্রুটি আমরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করি, এটা আমাদের ভুল হয়েছে।

ছোট্ট ডায়াস থেকে নেমেই পদ্মিনী শশীকান্তর কানে কানে কী যেন বললো। শশীকান্ত আবার আরও কয়েকজনের কানে কানে রিলে করে দিল। মুহূর্তে দেখা গেল ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটির তেত্রিশ জন মেম্বার তাদের অফিসের দিকে চলেছে। সবার আগে অবশ্যই পদ্মিনী ঊষা এবং অমিতাভ।

অমিতাভ আগেই ঠিক করে রেখেছিল মিঃ নামবিয়ার আজ তাকে যেভাবে কাজের জায়গায় গিয়ে বসতে বাধ্য করিয়েছেন, সেটা ইউনিয়নকে জানিয়ে দেবে। না জানিয়ে রেখে উপায় কী? যে কোনো মুহূর্তে অমিতাভ বিপদে পড়তে পারে। অথচ মনের দিক দিয়ে সে তো পরিষ্কার থাকতেই চাইছে। মিঃ নামবিয়ার চাকরি দিয়েছেন বলে অমিতাভ কোনোরকম কৃতজ্ঞতাবোধ করলো না। বরং উল্টোটাই ভাবছে। এতোগুলো মানুষের বিক্ষোভের সামনে তিনি তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং আজ যাতে বিরাট একটা গণ্ডগোল বাধে তিনি তেমনটাই চাইছেন। সেই কারণে আগে থেকে পুলিশকে ফোন করে জানিয়েও রেখেছেন।

পদ্মিনী ঊষা এবং কমিটি মেম্বারদের সব কথা বলে অমিতাভ ইউনিয়ন অফিসের বাইরে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিল। এবারে বিদায় নিতে হবে। আগামীকাল এক সময়ে এসে রেজিগনেশন লেটারটা মিঃ নামবিয়ারের হাতে ধরিয়ে দেবে। তার আগে জেমস গনসালভেসের সঙ্গে আজকেই একবার দেখা করতে হবে। সেটা

তো এক্ষুণিও হতে পারে! এখানে তার আর দরকার কীসের? অমিতাভ সাহেবদের কাউকেই কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলো না। আড়াই হাজার কর্মচারীদের স্থিরচিত্রকে ডানদিকে রেখে সে সোজা আম্বালামেড়ুর মোড়ের দিকে নিঃশংকচিত্তে পা বাড়ালো।

আম্বালামেড়ু থেকে কোন বাসটা সিটিতে যায় সেটা আগে জানা দরকার। অমিতাভ একজনকে জিজ্ঞেস করতেই যেটুকু জানতে পারলো তা হলো, ডাইরেক্ট সেই বাস পেতে দেরি হবে। তার চেয়ে যে কোনো বাসে ত্রিপুনীথুরা গিয়ে সেখান থেকে আবার বাস পাল্টালে অনেক আগে পৌঁছানো যাবে। অমিতাভ সেই-মতোই একটা বাসে উঠে বসলো।

ত্রিপুনীথুরা জংশনে নেমে অমিতাভ সিটির বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে হোটেল বালসাম্মার দিকে তাকালো। আর তখনই হঠাৎ তার মনে হলো আগামীকাল রেজিগনেশন লেটার সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নামবিয়ারও তার হাতে হোটেলের যাবতীয় খরচের বিলটিলও ধরিয়ে দেবেন। শিকার হাত থেকে বেরিয়ে যাবার আফশোসে এটা তিনি করবেনই। জেমসদাকে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার।

সরোজা ট্রান্সপোর্টের অফিসে পৌঁছে অমিতাভ শুনলো একটু আগেই জেমস গনসালভেস বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন ঘণ্টাখানেক বাদে। বাইরের সিটিং রুমে দু-চারজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। অমিতাভ সেখানে গিয়েই বসলো। মানসিক চাপ এবং অবসাদে তার বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ লড়াই করে সে আর জেগে থাকতে পারলো না। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে অমিতাভ একসময় ঘুমিয়েই পড়লো।

জেমস গনসালভেস সঠিক সময়েই অফিসে ফিরে এলেন। নিজের ঘরে ঢুকতে যাবার মুখে বাইরের সিটিং রুমে চোখ পড়তেই দেখলেন অমিতাভ কেমন যেন এক অসহায় ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে

রয়েছে। জেমস এক ধরনের মমতা অনুভব করলেন। সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে খুব আস্তে ডাকলেন, অমিতাভ!

দীর্ঘ রাত্রির শেষে ফুলের দল যেমনভাবে চোখ মেলে অমিতাভ তেমনভাবেই তাকালো। জেমস গনসালভেসকে সামনে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো। অস্ফুট স্বরে শুধু বললো, আপনি কখন এলেন?

এইমাত্র। তুমি?

অমিতাভ ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল, ঘণ্টাখানেক হবে।

তা এখানে বসে ঘুমাচ্ছিলে কেন? তুমি তো আমার ঘরে ঢুকতে পারতে—জেমস গনসালভেস অমিতাভর মুখখানা লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ বললেন, তোমার অফিসের খবর কী?

ঐ জনাই তো আসা। অমিতাভ ম্লান হেসে বললো, সে অনেক খবর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও—তার আগে বলো তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিছু? জেমস গনসালভেস ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অমিতাভ চুপ করে থাকতেই তিনি যা বোঝার বুঝে নিলেন। তারপরেই হুংকার ছাড়লেন, চলো—আগে খেয়ে আসা যাক।

অফিসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে জেমস গনসালভেস অমিতাভকে সঙ্গে করে আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবারে আর ড্রাইভার নিলেন না। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে অমিতাভ খুব মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছে দেখে এক সময় বললেন, পৃথিবীতে এই একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না, সেটা হলো গোমড়া মুখে থাকা। তোমার অফিসে যাই হয়ে থাক তা নিশ্চয়ই সব হারানোর ব্যাপার নয়। এতো ভেঙে পড়ার কী আছে?

জেমসদা, আপনি যদি সব···

সব শুনবো আমি। আমার প্রশ্ন হলো তুমি কেন মন খারাপ করে কষ্ট পাবে? কিছু কিছু ব্যাপারকে অবজ্ঞা করতে শেখো।

জেমস কথা বলছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল রাস্তার ওপরে। এখানে একটা মিশনারী স্কুল রয়েছে। বাচ্চারা

রাস্তা পারাপার হতে পারে। আর একটা টার্ন নিয়ে গাড়ি মসৃণ রাজপথে পড়তেই জেমস স্পীড তুললেন। ডানদিকে রাস্তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সুভাষচন্দ্র বোস পার্ক। বাঁদিকে আরব সাগরের নীল জলরাশি সাদা ফেনার ফণা তুলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপন মনে নেচে চলেছে। পার্কের শেষ মাথায় কোচিনের সবচেয়ে নামী হোটেল সী লর্ড।

জেমস গনসালভেস দুপুরে খাওয়া আগেই সেরে নিয়েছিলেন। সুতরাং একটা ডিশের অর্ডার দিলেন। দারুণ ঝকঝকে এবং শান্ত পরিবেশে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। জেমস আরব সাগরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তিনি শুধু এক কাপ কফি নিলেন। অমিতাভ খুব সংকোচে খাচ্ছিলো। অন্তত ওকে দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছে। জেমস হাসতে হাসতে বললেন, তুমি কিন্তু বড়ো লাজুক অমিতাভ। চুরি করে ধরা পড়া ছাড়া এতো লজ্জা থাকা ঠিক নয়। আমার সঙ্গে যখন মিশবে ঐ জিনিসটাকে পুরোপুরি কবর দিয়ে আসবে। ও কে? জেমস গনসালভেস হেসেই চলেছেন। তারপরেই বললেন, খেতে খেতে তোমার অফিসের খবরটা শোনা যাক—কী ঘটেছে আজ সেখানে? নো দায়সারা। ডিটেলস বলো—

অফিসে আজ সকালে পা রাখার পর থেকে যা যা হয়েছে অমিতাভ প্রতিটা ঘটনা নিখুঁতভাবে তুলে ধরলো। এমন কী সে যে আগামীকালই রিজাইন দেবে সেটাও জানিয়ে দিল! মিঃ নামবিয়ার হোটেলের বিল ধরিয়ে দিতে পারেন সেই আশংকার কথাটাও বাদ দিল না!

সব শুনেটুনে জেমস গনসালভেস প্রশান্ত হেসে জিজ্ঞেস করলেন, মেনু কার্ডের ওপর তুমি আর একবার চোখ বোলাও। আর কী কী খাবে বলো?

অনেক খেয়েছি জেমসদা। একটুও লজ্জা করিনি।

সত্যি বলছো?

বিশ্বাস করুন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করে আমি ঠকতে রাজী আছি কিন্তু অবিশ্বাস

করে নয়। কথাটা বলতে বলতে গনসালভেস কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। একটু সময় নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপরেই স্নিগ্ধ হেসে বলতে লাগলেন: আমি তখন তোমার বয়সী। বি কম, এল এল বি পাশ করেই একটা সংস্থায় চাকরি পেয়ে গেলাম। সেখানে অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারটা আমি দেখাশোনা করতাম। হ্যাঁ, আমার সেই মালিককে আমি বিশ্বাস করতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি চট করে কাউকে অবিশ্বাস করতে পারতাম না। কোনো একটা ব্যাপারে তাঁর পছন্দমতো কাজ না করাতে তিনি আমাকে চুরির দায়ে জড়ালেন। অমিতাভ, সেটা দু-তিন হাজারের অভিযোগ ছিল না। আমি নাকি তাঁর কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছি। এই এখন যেমন তুমি কথায় কথায় মন খারাপ করো আমিও তখন তোমার মতোই ছেলেমানুষ ছিলাম। তাই ভীষণভাবে ভেঙে পড়তে একটুও সময় লাগলো না। এখন যেমন আমার সামনেই আরব সাগর সেই সময় ধারে-কাছেও কোনো জলটল ছিল না। ছিল রেল লাইন। আমি সেখানেই মাথা পেতে দিয়ে বাঁচতে চাইলাম। বাঁচতে কিন্তু পারলাম না। জলে কুমীর, বনে বাঘ আর ডাঙায় মানুষ এই তিনের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে যাবতীয় অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস নিয়ে যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি, ঠিক তখনই একজন মানুষ এসেই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। সুন্দরম সাহেব রেলের চাকার হাত থেকে আমার মাথাটা বাঁচিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'ঈশ্বর এইজন্য নিশ্চয়ই আমাদের সৃষ্টি করেননি।' তারপরই 'প্রবল ঘৃণা এবং অসীম মমতায় একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, কাওয়ার্ড'। সেই থেকে আবার মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখলাম। জেমস গনসালভেস অমলিন হেসে বললেন, এই এখন যেমন তোমায় বিশ্বাস করলাম, তুমি একটুও লজ্জা করে খাওনি। কী বলো ?

ফেরার পথে অমিতাভ আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। এতোক্ষণ যেভাবে গুম হয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে গেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, জেমসদা, আপনার তাহলে আপত্তি নেই তো ?

কীসের ভাই ?

রিজাইন দেওয়ার···

আরে না-না ! আমি বরং উৎসাহ পাচ্ছি তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারবো বলে। তবে—জেমস গনসালভেস হঠাৎ থমকে পড়লেন।

তবে কী ?

আমার কাছে প্রথম হচ্ছেন জেসাস ক্রাইস্ট, দ্বিতীয় আমার বাবা-মা এবং তারপরেই সুন্দরম সাহেব। আমার মনে হয় সুন্দরম সাহেবকেই আমি বোধহয় এখন সবচেয়ে বেশি চিনি এবং জানি। তুমি আমার কাছে থাকবে এই দখলটা ছাড়তে চাইবেন না। আজকে রাতেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেবো। উনি কী বলবেন তা অবশ্য আমি জানি। সুন্দরম সাহেব খুশির গলায় বলবেন, অমিতাভকে এক্ষুণি মাদ্রাজে পাঠিয়ে দাও। অনেকদিন ধরেই এখানকার অফিসের জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি···জেমস গনসালভেস হাসির জয়রথ ছুটিয়ে বললেন, এক যদি তুমি মাঝে মাঝেই আমাকে জরুরি কাজের জন্য মাদ্রাজে কল করো, দেখা-সাক্ষাৎটা তাহলে ঠিকই থাকবে।

ঐ কথার কী উত্তর দেবে অমিতাভ ? সে শুধু জেমসের ব্যবহারে মুগ্ধই হলো না, সেই সঙ্গে আপ্লুতও হলো। গভীর সুরে অমিতাভ একটা কথাই বলতে পারলো, জেমসদা, আপনি মানুষকে বড়ো ভালোবাসতে পারেন। কথাটা শুনতে মন্দ লাগলো না। খুব সাধারণ কথা কিন্তু জেমস গনসালভেসের কানে মধুর ছন্দে তা রিনরিন করে বেজে চলেছে। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখলেন জেমস। ডান হাতটা দিয়ে আবেগে বুকে পবিত্র ক্রুশ এঁকে উত্তর দিলেন, জেসাস ক্রাইস্ট তো আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

অফিসে পৌঁছে জেমস গনসালভেস প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো বাকি ছিল তাতে মন দিলেন। অমিতাভ একবার শুধু বলেছিল, জেমসদা, আমি তাহলে চলি ? 'না—না, যাবে না' বলে জেমস

আবার নিজের পড়ে থাকা কাজে ডুব দিলেন। টেবিলে গোটা তিনেক ফাইল এবং বেশ কিছু চিঠিপত্র জমে ছিল। সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা করতে জেমস গনসালভেস ঘণ্টা দেড়েকের মতো সময় নিলেন। তারপরেই হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে এক করে একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, কালকে আমি অফিসে আসবো বটে তবে বেশিক্ষণ থাকবো না। লাঞ্চের অনেক আগেই চলে যাবো। তুমি এক কাজ করবে—আমার বাড়ি তো নিশ্চয়ই জানো না!

আজ্ঞে না।

চেনাটা অবশ্য এমন কিছু কঠিন নয়। অমিতাভর হাতে ছোট্ট একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে জেমস বললেন, নেহরু স্টেডিয়াম ধরে সোজা এগিয়ে গেলে বাঁদিকে চমৎকার একটা সিনেমা হল দেখতে পাবে। ওটা কবিতা। কবিতার পাশের রাস্তায় ঢুকে ঠিক দু'মিনিটের মাথায় ডানদিকে চোখ রাখবে। সাদা রংয়ের ছোট্ট একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের নারকেল গাছটাতে দু-দুটো ঘুড়ি জব্বরভাবে আটকে রয়েছে দেখবে—অন্তত আসার সময়েও আমি সে দুটোকে দেখে এসেছি। ইতিমধ্যে কেউ যদি পেড়ে না থাকে তাহলে তুমিও তার দর্শন পাবে।

অমিতাভ কথাগুলো শুনছিল আর নিশ্চুপে হাসছিল। সবার আগে প্রথম যে কথাটা তার মনে হলো, জেমসদার মতো এমন বয়স্ক ছেলেমানুষ এই পৃথিবীতে আর ক'জন আছে? জেমস গনসালভেস কিন্তু ওকে বেশি ভাবাভাবির মধ্যে রাখলেন না। তিনি যেমন বলছিলেন তেমনই বলতে লাগলেন, বাড়িটা তাহলে চিনলে! আগামীকাল দুপুরে ওখানে অতি অবশ্যই পৌঁছানো চাই। আমরা তোমার জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করবো।

কিন্তু

হ্যাঁ, তার আগে ঐ পবিত্র কর্মটি সেরে ফেলবে। রিজাইন দিয়ে অন্য কোথাও আর অপেক্ষা করবে না। সোজা আমার বাড়ি—মনে থাকবে?

থাকবে। অমিতাভ নীরবে হাসতে লাগলো।

তাহলে এখন উঠতে পারো। আমাকে আরও কিছুটা কাজ করতে দাও। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যাওয়াতে জেমস আবার হৈ হৈ করে উঠলেন, আর হ্যাঁ—আসল কথাটাই তো বলা হলো না, মিঃ নামবিয়ার যা একখানা ছুঁচো, হোটেলের বিলটিলের প্রশ্ন তুলবেনই। তুমি কিন্তু কোনোরকম প্রতিবাদের মধ্যে যাবে না। ওঁকে ক্ষমা করবে। আইনের পথে অবশ্য যাওয়া যায় তবে বিদায়কালে উদার থাকাই ভালো। বিনীতভাবে তোমাকে কতো দিতে হবে সেই অ্যামাউণ্টটা শুধু জিজ্ঞেস করবে। এনি মোর প্রবলেম ?

পুরো প্রবলেম তো আপনি সলভ করেই দিলেন।

আমি কিছুই করিনি। জেমসের সারা মুখে সূর্যকিরণের হাসি। জেসাস ক্রাইস্ট আমাদের মধ্যে দিয়ে করান! কথাটা তিনি শেষ করেছেন কী করেননি—তারপরেই আবার চিৎকার করে চেয়ারে দোল খেতে খেতে বললেন, আরে ঐ ব্যাপারটা তো প্রায় ভুলেই গেছিলাম। সাদা বুইকটা তোমার হোটেলে কাল পাঠিয়ে দেবো তো ?

প্লিজ জেমসদা, আপনি কিন্তু এবারে প্রবলেম বাড়াবেন বলে মনে হচ্ছে !

দারুণ বলেছো কিন্তু। গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন জেমস। দিস ইজ দ্য সুইট ক্যারেকটারেসটিক অব বেঙ্গলী পিপল্। মাথা নাড়িয়ে জেমস গনসালভেস সমানে তারিফ জানাতে লাগলেন।

পরদিন সকালে একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলো অমিতাভ। অন্যান্য দিন যেখানে সকাল আটটার মধ্যে অফিসে পেঁছে যেতো আজ সেখানে উঠলোই আটটায়। স্নানটান সেরে একেবারে তৈরি হয়ে নিয়ে সে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো। গঙ্গাধরম সুপ্রভাত জানিয়ে পরিচ্ছন্ন হেসে জিজ্ঞেস করলো, আজকে কী খাবেন স্যার ?

যা দেবে।

তবে মহীশূর মসলা ধোসা খান।

তাই দাও। তবে দুপুরে খাবার কোনো আয়োজন রেখো না। আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রয়েছে।

অমিতাভ যখন মহীশূর মসলা ধোসাকে প্রায় শেষ করে এনেছে সেই সময় গঙ্গাধরম আর একবার ওর টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হলো। আপন সুরে বললো, এই খাবারটা আমার মা চমৎকার তৈরি করেন। মা ভেবেছিলেন আপনি সেদিন আমাদের ওখানে থাকবেন। আপনি চলে আসার পর তাই বারবার দুঃখ করছিলেন, থাকবে না জানলে ছেলেটাকে আমি আজকেই ওটা বানিয়ে দিতাম। গঙ্গাধরম আরও নিচু গলায় বললো, সেই কারণেই স্যার আজকে হঠাৎ ইচ্ছে হলো আপনাকে মহীশূর মসলা ধোসা খাওয়াতে। আবার করে সুযোগ পাবো না পাবো তা কে বলতে পারে বলুন?

অমিতাভ চমকে ওর মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। যদিও লুকানোর কোনো ব্যাপার নেই তবুও সে এই মুহূর্তে কিছু ভাঙলো না। শুধু বললো, তুমি খুব একটা ভুল বলোনি গঙ্গাধরম। এমনটা হতেই পারে।

অফিসে পৌঁছে অমিতাভর মনে হলো সে বুঝি গতকালের দিনটাতেই ফিরে গেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে মানুষের সেই একই জমায়েতের ছবি। তবে গতকালের চেয়ে আজকের দৃশ্যটা অন্যরকম। কর্মচারীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে কেউ কথাবার্তা বলছেন না। প্রত্যেকেই মাটিতে বসে আছেন বেশ ঘন হয়ে। এক নজরে মনে হওয়া স্বাভাবিক এটা বুঝি কোনো মৌন সমাবেশ! নাকি মৌন প্রতিবাদ? অমিতাভ বিল্ডিং-এর সিংহ-দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে কেউ বাধা দিল না। ওর দিকে আগুনের হলকা নিয়ে কেউ ফিরেও তাকালো না।

অমিতাভ যখন মিঃ নামবিয়ারের ঘরে ঢুকতে যাবে সেই মুহূর্তে তোশিবা জেকব নাভিকুণ্ডে ঢেউ তুলে তার ঘর থেকে ছুটে এলো। ছুটে না এসে বরং আছড়ে পড়লো বলাই ভালো। সে তখন রীতিমতো অসন্তুষ্ট। বিরক্তিতে দুই ভুরু ধনুকের

মতো কপালের ওপর উঠে গেছে। তোশিবা জেকব সঙেগ সঙেগ প্রশ্ন করলো, আপনি করছিলেন কী ?

কী করছিলাম ? অমিতাভ উল্টে ওকেই প্রশ্ন করলো।

এইভাবে এম, ডি'র ঘরে ঢোকাটা শোভনীয় নয়। আমার কাছে আপনার একবার আসা উচিত ছিল।

ছাড়পত্র নিতে ?

সেটা আপনি যা খুশি মানে করতে পারেন। তবে এটা তো ঠিক, পারমিশন না নিয়ে আপনি ও'র ঘরে ঢুকতে পারেন না !

আমি অনেক কিছুই পারি মিসেস জেকব—সেটা আবার আপনিও জানেন না। তোশিবাকে বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে রেখে অমিতাভ ঝকঝকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

মিঃ নামবিয়ার মিটিং করছিলেন। ঘরে তখন রামাকৃষ্ণাণ, পিল্লাই এবং ফিলিপস। প্রত্যেকের চোখে মুখেই একটা চাপা দুঃশ্চিন্তার ছাপ। গোপন শলা-পরামর্শ থামিয়ে দিয়ে ওরা চার-জনই খুব বিরক্ত হয়ে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিঃ নামবিয়ার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অমিতাভ ওর রিজাইন লেটারটা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল।

হ্যাঁ, মিঃ নামবিয়ার প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন। আসলে অমিতাভ চাকরিতে রইলো কী গেল তাতে ও'র বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্য। অমিতাভকে রাখার জন্য ওদের বিরাট একটা ইণ্টারেস্ট রয়েছে। সেই কারণেই মিঃ নামবিয়ার বললেন, তুমি এটা ঠিক করলে না।

আমি নিঃসন্দেহ, ঠিক কাজই করেছি। অমিতাভর গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর।

তুমি অকৃতজ্ঞ ! রাগে-অপমানে মিঃ নামবিয়ার কাঁপছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি ছেলেটা রিজাইন করে তাঁকে এইভাবে পথে বসিয়েও আবার অমন করে কথা শোনাবে ! তবে তাঁর বোধহয় আরও কঠিন কথা শোনার বাকি ছিল। অমিতাভ সকলের মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে পরে ব্যঙেগর সুরে উত্তর দিল, অকৃতজ্ঞরা আমাকে তেমনটা ভাবতেই পারেন।

চারজনই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। দুঃসাহসের কোন পর্যায়ে গেলে মানুষ এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে তাঁরা সেটাই নিজেদের মনে পরখ করে নিচ্ছিলেন। এর পেছনেও কী পদ্মিনী উষার কোনো শক্তি নেই? মেয়েটা নিশ্চয়ই কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে অমিতাভকে দিয়ে এই চালটা দিয়েছে। মিঃ নামবিয়ার হাজারো প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না অমিতাভ কেন পদ্মিনীর ফাঁদে পা দিল? আর এক বছর ধরে বেকার থাকা ছেলেটা মুখের ওপর কতো অনায়াসেই না ঐ সাংঘাতিক কথাটা বলে ফেললো! কষ্টটা বেশি হচ্ছে অন্য কারণে। এই ধরনের বেয়াদপ ছেলের গালে যে ওজনের একটা চড় মারা উচিত মিঃ নামবিয়ার তেমনটা করতে পারছেন না বলে। অথচ নীরবে হজম করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, আমাকে অকৃতজ্ঞ বলেছো ঠিক আছে। কিন্তু সামান্য একজন কর্মচারীকে হোটেলে রাজকীয়ভাবে থাকার যে সুযোগ-সুবিধা কোম্পানী দিয়েছে তার মুখে ঐ শব্দটা বড়োই বেমানান।

হোটেলে থাকাটা কি আমার নিজের ইচ্ছেয়? অমিতাভ একটু চড়া মেজাজে উঠবার মুখেই জেমসদার কথাগুলো মনে পড়ে গেল। কোনোরকম তর্কে নিজেকে জড়াবে না এবং বিদায়কালে উদার থাকাই ভালো। অমিতাভ চমৎকারভাবে বিদ্রোহের রাশটুকুর ওপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে মিঃ নামবিয়ারকে করুণা দেখালো, আপনি যে আপনার কথা রাখবেন না তা আমি জানতাম। সুতরাং বোকা লোকেরাই শুধু আপনার ওপর ভরসা করে থাকবে। কথাটা শেষ করে অমিতাভ আর এক সেকেণ্ড দাঁড়ালো না। ঠিক যেভাবে ঢুকেছিল তার চেয়েও ঝড়ের গতি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অফিস ছেড়ে বেরুবার মুখে অমিতাভ বারবার চারদিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু যে আশা নিয়ে চোখ দুটো খুঁজছিল তাদের কাউকেই নজরে এলো না। পদ্মিনী উষা, শশীকান্ত অথবা রাজন কেউ নেই। কমিটির অন্যান্য মেম্বারদেরও দেখা গেল না।

অমিতাভ শেষবারের মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর ওপর চোখের ছায়া রেখে আস্তে আস্তে আম্বালামেডুর বাস স্টপেজের দিকে পা বাড়ালো।

এখন বেলা পৌনে বারোটা। রাস্তার চারপাশে গনগনে রোদের খেলা। তবে হাঁটতে তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না। কোচিনের সবুজ ছায়া মাথায় যেন ছাতা ধরে আছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই একঝলক শীতল বাতাস এসে শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছিলো। অমিতাভ একটা সিগারেট ধরালো। কবিতা সিনেমা হলটা এখন তার চোখের সামনে। তার মানে এবারে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরতে হবে।

এই হলো জেমসদা। এইভাবেও নিজের বাড়ি চিনিয়ে দেওয়া যায়। অমিতাভ একপলক সাদা বাড়িটায় চোখ বুলিয়ে নারকেল গাছের মাথায় আটকানো ঘুড়ি দুখানার দিকেই তাকিয়ে রইলো। অর্থাৎ এটাই আসল ব্যাপার। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরে দেখা আছে।

পেছন থেকে গাড়ির হর্নের আওয়াজ কানে যেতে অমিতাভ সরে দাঁড়ালো। একজন সুন্দরী মতো মহিলাকে পাশে নিয়ে একটি ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল। সে মালয়লম ভাষায় মুখটুখ বিকৃত করে কী যেন বলতে বলতে চলে গেল। অমিতাভ এতো-টুকু রাগ করলো না। দোষ তো তার নিজেরই। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুড়ি দেখছে। ড্রাইভার গালাগাল করবে না তো কী? কিন্তু খিস্তিটা কী হতে পারে? বিশ্বের সব ড্রাইভারদের ভাষা এক এবং পাশে যতো সুন্দরী মহিলাই থাকুক না কেন মুখ থেকে অতি সহজে যেটা বেরিয়ে আসে তা হলো, শুয়োরের বাচ্চা! ওটাকে আবার হিন্দিতে বলা চাই, শুয়ার কী বাচ্চে। কলকাতার বাঙালী ড্রাইভাররা ওতেই নাকি বেশি জোর পায়। এই ছেলেটিও মালয়লম ভাষায় না বলে হিন্দিতে বললে পারতো। অনুমানের ওপর নির্ভর না করে অমিতাভ তাহলে বুঝতে পারতো সঠিক তাকে কোন কথাটা বলা হলো।

জেমস গনসালভেস বাড়িতেই ছিলেন। অমিতাভকে দেখে তিনিই হৈ হৈ করে উঠলেন। এবং সেই ব্যাপারটা এতো জোরে হয়েছিল যে ভেতর থেকে একজন বছর প'য়ত্রিশ-ছত্রিশের মহিলা হঠাৎ কী হলো ভেবে প্রায় দৌড়েই এলেন। ছুটে এলো বছর চোদ্দ এবং বছর আটেকের দুটি মেয়েও। জেমস অমিতাভর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন : এই যে হাসিখুশি মহিলাটিকে দেখছো ইনি অবশ্যই আমার স্ত্রী। দেখতে যেমন পুতুল পতুল, নামও কিন্তু তাই-ই। অমিতাভ হাত জোড় করে নমস্কার করলো। জেমসদা যেমনই কালো তাঁর স্ত্রী ঠিক ততোটাই ফর্সা। সেই কারণেই তিনি ঐ রসিকতা করলেন। আর এই দুটো হলো—জেমস মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে হাসলেন, আমার দুই গার্জেন। তারপরেই তিনি মেয়েদেরকে সস্নেহে নির্দেশ দিলেন, আঙ্কেলকে নমস্কার করো। মেয়ে দুটো অবশ্য তার আগেই ভদ্রতার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুতুল কফি, কেক এবং কাজুবাদামের প্লেট সাজিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে উপস্থিত হলো। জেমস এবং অমিতাভ গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। পুতুল একমুখ হাসি নিয়ে অমিতাভকে বললো, এটুকু খেয়ে নিন ভাই।

এক্ষুণিই তো ভাত খাবো। কী দরকার ছিল এসবের ?

দরকার আছে। মৃদু হেসে পুতুল স্বামীর দিকে এক পলক তাকিয়েই অমিতাভর মুখের ওপর সস্নেহ এক দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—একটা উনপঞ্চাশের আগে কোনোরকমেই ভাত পাওয়া যাবে না। তখন কিন্তু খিদে পেয়েছে বলতে পারবেন না—

হ্যাঁ, একটা আটচল্লিশে খেতে চাইলেও হবে না। জেমস পুতুলের কথার সমর্থন জানিয়ে জোরকদমে হাসতে লাগলেন।

এসব আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশের ব্যাপারটা কী বলুন তো ? অমিতাভর হাসিটা সম্পূর্ণ না বোঝার।

ব্যাপারটা কী ওকে বলা যাবে ? জেমস পুতুলকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার তো মনে হয় না বলাই ভালো। রহস্যের হাসি নিয়ে পুতুল উত্তর দিল, অন্তত খাওয়ার আগে তো নয়ই।

পুতুল যখন বলেছে, আর বলা যাবে না। শেষ বিধান দিলেন জেমস। আমার সেই সাহস নেই অমিতাভ।

আপনাদের কাউকেই কিছু বলতে হবে না এখন। আমিও এতো বাধা-নিষেধের মধ্যে শুনতে চাই না। অমিতাভ ছোট্ট ছেলের সরলতা নিয়ে কাজুবাদামের প্লেটটা টেনে নিলো। একটা উনপঞ্চাশের আগে ভাত যখন পাবো না তখন এগুলোর ওপরেই ভরসা করা যাক।

পুতুল ড্রইংরুম ছেড়ে চলে গেল রান্নার তদারকি করতে। কফি, কাজু এবং কেক খেতে খেতে অমিতাভ জেমসদার কাছ থেকে যেটুকু জানতে পারলো তা হলো এইঃ উনি গতকাল রাতেই সুন্দরম সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। সুন্দরম সাহেব পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন অমিতাভ যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মাদ্রাজে গিয়ে যেন পেঁছায়। মাদ্রাজ অফিসেই সে বসবে। সরোজা ট্রান্সপোর্টের সরোজারও এটাই ইচ্ছে। আর হ্যাঁ, সুন্দরম সাহেব খোলাখুলি অন্য যে কথাটা জানাতে ভোলেননি তা হলো, অমিতাভকে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের ডেজিগনেশন দেওয়া হবে। মাসিক দক্ষিণা সাতাশশো পনেরো টাকা। উজাড় করে দেবার ইচ্ছে থাকলেও সুন্দরম সাহেবকে অফিসের নিয়মকানুন মেনে চলতেই হবে। এই কষ্টটুকু যেন অমিতাভ মেনে নেয়।

গভীর কৃতজ্ঞতায় অমিতাভর চোখে জল আসছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। যা পেয়েছে এর মূল্য তার কাছে অপরিসীম। কোথা থেকে কোথায় তাকে সুন্দরম সাহেব তুলে দিলেন অথচ কী বিনয়েই না জানালেন, এটুকু কষ্ট যেন সে মানিয়ে নেয়।

গল্পে গল্পে সময় বাড়ছিল। ঘড়ি দেখার প্রয়োজন ছিল না। তাই ঐ বস্তুটির ওপর কেউ নজর দেয়নি। কেউ বলতে অমিতাভ এবং জেমস। ইতিমধ্যে মেয়ে দুজন এসে জেমসকে আদর করে

ঘিরে ধরলো। অমিতাভকে বললো, আঙ্কেল, ভেতরে চলো। এখন বাবার জন্মদিন পালন করবো।

অমিতাভ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জেমস গনসালভেসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খুবই আস্তে বললো, জেমসদা, আমাকে তো এটা আগেই জানাতে পারতেন! আমার অবশ্য আগেই একবার সন্দেহ হয়েছিল আপনার পরনে নতুন লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি দেখে কিন্তু ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত জন্মদিনে গড়াবে এটা বুঝতে পারিনি।

কাঁটায় কাঁটায় একটা ঊনপঞ্চাশে পুতুল দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামীর জন্মদিনের মুহূর্তটাকে মুখরিত করে তুললো। জেমস একটা শিশুর মতো মোমবাতিগুলোক ফুঁ দিয়ে একে একে নিভিয়ে দিয়ে মহানন্দে কেক কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাচ্চাদের বললেন, জোরে হাততালি দাও। মেয়েরা বাবার কথা শুনলো। জেমস আড়চোখে একবার অমিতাভর দিকে তাকালেন। ছোট্ট সুরে অভিযোগ করলেন, তুমি হাততালি দিচ্ছো না কেন? বড়ো হয়ে গেছো বুঝি? বলেই উচ্চগ্রামে হাসতে লাগলেন। বিব্রত অমিতাভ জোরে জোরে হাততালি দিয়ে ত্রুটি শুধরে নিলো।

খেতে বসে একটা অভিনব ব্যাপার দেখে অমিতাভ কৌতুক অনুভব করলো। মাছ, মাংস ভাজা এবং সব্জির বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও জেমসদার ডিশের কাছে এক প্লেট স্পেশাল করলাভাজা ও ডিমের কারি। ঐ দুটো জিনিস নিয়ে অমিতাভ একটু নাড়া দিতেই পুতুল হেসে ফেললো, বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না? জেমস মুখ খুললেন, যতোই খাবার-দাবার থাক না কেন—করলাভাজা আর ডিম না দেখলে আমি সারা বাড়ি মাথায় করে চিৎকার করবো। ঐ ব্যাপারে আমার কাছে কারো ক্ষমা নেই। জেমস এবারে হাসতে লাগলেন, কেরালার মানুষ বলেই যে করলাভাজা ভালোবাসি এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে ডিম আর করলা আমার প্রাণ!

তাহলে শুনবেন ওঁর কথা? পুতুল অমিতাভর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বামীর মুখখানা লক্ষ্য করলো। আমাদের রান্নার জন্য

যে মেয়েটি আগে ছিল সে ভুল করে একদিন করলাভাজা দেয়নি। আপনার জেমসদার সে কি রাগ! মেয়েটাকে বিদায় করে তবে ওঁকে ঠাণ্ডা করতে হলো। আর একটা ব্যাপার শুনবেন? করলাভাজা খেয়ে একজনের দিন মজুরি আঠারো টাকা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি টাকা করে দিয়েছিল। মুখে অবশ্য বলেছিল ছেলেটা খুব কাজের। এখন আপনিই বলুন এই মানুষের সামনে এমন এক শুভদিনে করলাভাজা এবং ডিম না রেখে উপায় আছে? শেষে আমাকে বাপের বাড়িতে ফেরৎ দিয়ে আসুক আর কি—পুতুল খুশির হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে তুললো।

সন্ধ্যা সওয়া ছটা নাগাদ অমিতাভ হোটেল বালসাম্মাতে ফিরে আসতেই গঙ্গাধরম্ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো। আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন স্যার? যদিও দুপুরে খাবেন না বলে গেছেন কিন্তু এতোটা সময় পর্যন্ত—

কি হয়েছে কী?

পদ্মিনী উষা দুবার আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলেন এখানে। একবার তো শশীকান্তভাই এবং রাজন নিজেরাই এসেছিল।

কিছু বলে গেছেন ওঁরা?

না। শুধু জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি কখন ফিরতে পারেন? বলেছি—আপনি সেটা আমাদের জানিয়ে যাননি। কাজেই বলা সম্ভব নয়।

মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে অমিতাভ স্নানে ঢুকলো। যদিও সকালে একবার স্নান করেছে কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য আর একবার স্নানটা খুবই জরুরি। এটা ঠিক কলকাতার মতো ভ্যাপসা গরম এখানে নেই এবং রাতেও একটা চাদর গায়ে জড়াতে হয়—তবুও সন্ধ্যার এই স্নানটা শরীরকে বেশ ঝরঝরে করে দেয়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে অমিতাভ চুল আঁচড়িয়ে নিলো। বাড়িতে একটা চিঠি লিখবে কিনা ভাবছিল। তার অবশ্য দরকার নেই

কাল পরশুর মধ্যেই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে মাদ্রাজে চলে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছেই বাড়িতে চিঠি দেবে। হ্যাঁ, আর একটা চিঠিও লিখতে হবে। সেটা রাখালকাকাকে। মিঃ নামবিয়ারকে ধরে চাকরিটা তো তিনিই করে দিয়েছিলেন। জীবনে সামান্য একটু উপকারও যিনি করেছেন অমিতাভ তাঁদেরকে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না।

অমিতাভর হাতে এখন কোনো কাজ নেই। সিগারেটের প্যাকেটও ভর্তি, সুতরাং বাইরে যাবার প্রশ্ন নেই। সে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। মালয়লম ভাষায় ছাপা, তাই পড়ার চেষ্টা করা বৃথা। সে ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

ভেতরে আসবো? দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পদ্মিনী ঊষা পারমিশন চাইলো।

অমিতাভ প্রথমে শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বারের ডাকে সে দরজার দিকে তাকিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পদ্মিনীর কাছে। এই মেয়েটির সঙ্গে সে কলকাতা থেকে এই কোচিন পর্যন্ত এসেছে অথচ একটাও কথা হয়নি। সেদিন ওর ওপর অদৃশ্য এক অভিমান জমা হয়েছিল। আজ কিন্তু সহজেই সে-কথা ভুলে গেল অমিতাভ। যাবার সময়ে দুঃখ রেখে কি লাভ?

ভেতরে আসতে বলবেন না? পদ্মিনী খুব নিচু গলায় জানতে চাইলো।

নিশ্চয়ই আসবেন। অমিতাভর উচ্ছ্বাস এবং আবেগ কোনোটাই নেই। আছে নিদারুণ এক ভদ্রতা।

ঘরের মধ্যে তখন নিঃশব্দের প্রহর। নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দকেও সমুদ্রের গর্জন বলে মনে হয়। অমিতাভ মাথা নিচু করে বিছানার ওপরে বসে আছে। পদ্মিনী মুখোমুখি একটা চেয়ারে। দুজনেই হয়তো ভাবছে অপর পক্ষ আগে কথা বলুক। তবে অমিতাভ নিঃসন্দেহ এই মুহূর্তে আগে বলার দায়িত্বটা পদ্মিনীই নেবে। সে চোখ তুলে তাকাতেই দেখলো পদ্মিনী

ঊষা ওরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অমিতাভ দৃষ্টি সরিয়ে নিলো না।

আপনি রিজাইনটা দিতে গেলেন কেন? অমিতাভ চুপ করে রয়েছে দেখে পদ্মিনী সামান্য একটু অধৈর্যের সুরে বলে উঠলো, আপনাকে তাড়ানো কি আমাদের উদ্দেশ্য ছিল? সেই ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারছেন তখন এইভাবে চাকরি হারানোর কি অর্থ? জিনিসটা যা চলছিল তাতে আপনার খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ফেসটা তো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরাই করছিলাম। আপনি যাতে অসুবিধায় না পড়েন ইউনিয়ন কি সেটা দেখেনি? অন্য কে কি ভাবছে জানি না—আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ইউনিয়নের প্রতি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা নিয়ে যাচ্ছেন না!

যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়েই যাচ্ছি।

তাহলে এই কাজটা করলেন কেন? আমরা আপনার এমন বিরোধী নই যে এই ব্যাপারে আমাদের খুশির কোনো কারণ থাকতে পারে। আমরা চাইছিলাম আপনাকে সামনে রেখে রাজনের ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিতে। রাজনের কেসটা সলভ হবেই। মধ্যে থেকে আপনাকেই আমরা হারালাম। আপনি থাকলে ইউনিয়নের মেম্বার তো হতেনই!

নিশ্চয়ই। অমিতাভ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, সংগঠন ছাড়া একা একা কি বাঁচা যায়? তারপরেই সে অন্য এক সুরে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, আসলে আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মিঃ নামবিয়ারের ওপর বীতশ্রদ্ধও বলতে পারেন। আমি যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ওঁরা আমাকে প্রাণহীন কাকতাড়ুয়ার মতো ব্যবহার করছেন সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে, তখন আমার যে প্রাণ রয়েছে, প্রতিবাদ রয়েছে সেটা বোঝানো বড়ো বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রিজাইন দিয়েছি অন্যায় করিনি বলে। আপনাদের কারো মনেও যদি কোনোরকম সন্দেহ থেকে থাকে আমি হাত মিলিয়ে এখানে এসেছি—সেটাও দূর হলো। একটু সময় চুপ করে থেকে অমিতাভ বললো, তবে আমি একটা চাকরিও পেয়ে গেছি।

কোথায়? এই প্রশ্নটা করা অহেতুক কৌতূহল এবং অশোভনীয় হতে পারে ভেবে পদ্মিনী তাই কোনোরকম জিজ্ঞাসা না করে অমিতাভর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো। পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে অমিতাভও ওর সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে সুন্দরম সাহেব, জেমস গনসাল্ভেস এবং সরোজা ট্রান্সপোর্টের কথা একে একে বলে যেতে লাগলো। মাদ্রাজ অফিসে নিজের ডেজিগনেশন এবং সালারির কথাও বাদ দিল না।

কবে যাচ্ছেন?

আগামীকাল বিকেলের ট্রেনে যাবো বলে ঠিক করেছি।

পদ্মিনী এবং অমিতাভ দুজনেই এর পরে কোনোরকম কথারই সূত্র ধরতে পারলো না। ফলে নিস্তব্ধতার পাথরটা দুজনকে আলাদা করে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। অমিতাভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কফি দিতে বলি?

না, থাক।

এক কাপ কফি খেতে এতো আপত্তি কিসের? বেল টিপে গঙ্গাধরমকে ডেকে অমিতাভ দুকাপ কফির অর্ডার দিয়ে নিচু সুরে আর একটা কথাও বললো, কিছু খাবারও এনো! শেষের কথাটা পদ্মিনীর কান এড়ালো না। সে তাই সোজাসুজিই বললো, আমার জন্য কিন্তু শুধু কফি।

গঙ্গধরম চলে যাওয়ার পর আবার সেই নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা হতে হলো ওদের। শূন্যতা বুঝি দুজনকে এক মহাশূন্যে পেঁছে দেবে। এইভাবে কতোক্ষণ ভেসে থাকা যায়? অমিতাভ আস্তে আস্তে বললো, রাজনের ব্যাপারটা আশা করি এবারে মিটে যাবে।

ওটা ছিল ম্যানেজমেন্টের খামখেয়ালিপনা। মিটবে না মানে? পদ্মিনী একটু ভেবে নিয়ে পরে আরও বললো, তবে আপনি রিজাইন না দিলেও ওটা কোনো সমস্যা ছিল না। ওঁরা সুষ্ঠু-ভাবে কোনো জিনিসের মীমাংসা চান না। জল ঘোলা করবেনই। এই দেখুন না—সব কর্মচারীদের নিয়ে পরপর দুদিন চাপ সৃষ্টি করতেই আঘাত সামলাবার জন্য ওঁরা প্রথমেই পুলিশ-টুলিশ

ডেকে এনে আমাদের আটজনকে অ্যারেস্ট করালেন। কিন্তু হলোটা কি? থানা তো দূরের কথা—গেটের বাইরে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলো না। এসব ওঁরা করবেনই। যাই হোক, ম্যানেজমেন্ট শেষে আলোচনায় ডাকলেন। কথায় কথায় যখন বললাম গত দুবছরের ব্যালান্সশীট এবং এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যে কোম্পানী যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিয়েছে তার অ্যামাউন্টটা কতো সেটা জানান। শুধু তাই নয়, ঐ অ্যাডভান্স ট্যাক্সের যে টাকাটা কোম্পানী পরে ফেরৎ পায় সেই অঙ্কটাই বা রহস্যজনকভাবে কোথায় উধাও হয় সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই থতমত খেয়ে একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এসব প্রশ্ন এই আলোচনায় কি করে আসে? শেষ পর্যন্ত নীট রেজাল্ট দাঁড়ালো ওঁরা আর আমাদের বোম্বাইয়ের বোর্ড মিটিং দেখাচ্ছেন না। রাজনের কেসটা আগামী সোমবারের মধ্যে মিটে যাবে বলে আশা করা যায়। ঐ সময়েই জানতে পারলাম কোম্পানি ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন। যেটা আমরা কেউই চাইনি। শেষের কথাটা বলতে বলতে পদ্মিনী আবার অমিতাভর চোখের দিকে তাকালো।

আমি তো বেটার চান্স পেয়েই যাচ্ছি। অমিতাভ একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

সেটা ঠিক। তবুও আমরা বুঝি একটু অপরাধী থেকে গেলাম।

এটা কেন ভাবছেন? আপনাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে তো আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং আপনাদের ভূমিকার প্রশংসাই করবো।

গঙ্গাধরম কফি দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট ছোট্ট দুটো চুমুক বসিয়ে পদ্মিনী যেন এবারে একটু সিরিয়াস হলো। সে তার গাম্ভীর্যের ভেলায় বসে আসল কথা শুরু করলো, আপনার ব্যাপারটা জানার পরেই ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং বসে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। প্রথমত আপনি ইউনিয়নের মেম্বার নন, দ্বিতীয়ত রিজাইন দিয়ে যে কেউই চলে

যেতে পারে তাতে বাধা-নিষেধের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু আপনার কেসটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। জরুরি মিটিংটা সেই কারণেই। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে উইথড্র করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হবে।

এই অনুরোধের জন্য আপনাদের সংগঠনের সমস্ত এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার আর ফেরার উপায় নেই। মাদ্রাজের ব্যাপারটা তো রয়েছেই তাছাড়া অমিতাভ আস্তে আস্তে মিঃ নার্মবিয়ারের সঙ্গে তার কথা কাটা-কাটির পুরো ছবিটা তুলে ধরে আবেদনের সুরে জিজ্ঞেস করলো, এর পরে কি এখানে থাকা সম্ভব ?

পদ্মিনী কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তবে কি যেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো অমিতাভর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো অধিকার নেই। এরপর অন্য প্রসঙ্গের কথা টেনে আলোচনার অর্থই হলো জোর করে কাছে থাকার চেষ্টা। পদ্মিনী নিস্তেজ গলায় বললো, আমি তাহলে উঠি!

যাবেন ? অমিতাভ আন্তরিকতা দেখিয়ে বললো, চলুন আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা ত্রিপুনীথুরার মোড়ে এসে দাঁড়ালো। অমিতাভ আর পদ্মিনী পাশাপাশি অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো। অমিতাভ এক সময় জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় কে আছে আপনার ?

প্রশ্নটা শুনে চোখ তুলে অমিতাভকে দেখে নিলো পদ্মিনী। এখন মনে হচ্ছে, কলকাতা থেকে এতোটা পথ দুজনে একসঙ্গে আসা সত্ত্বেও একটাও কথা হয়নি—এটা আর যাই হোক, সহযাত্রী-সুলভ মনোভাব কিছুতেই নয়। কিন্তু দোষটা কার ? অমিতাভর না তার নিজের ? পদ্মিনী কোমল গলায় উত্তর দিল, ওখানে আমার দাদা রয়েছেন।

কোথায় বলুন তো ?

সাউথে লেক কালীবাড়ি আছে না—তার ঠিক আগেই একটা অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে।

অমিতাভ সামান্য হেসে বললো, আমাদের বাড়ি থেকে তো তাহলে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ।

তাই! পদ্মিনীর দুই ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ এক রেখা।

কথা বলতে বলতে ওরা চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পদ্মিনীকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলো, এখানে দাঁড়ালেন যে?

এই তো আমাদের বাড়ি!

ও। অমিতাভ দেখলো ত্রিপুনীথুরা থেকে এখানে আসতে তাদের সময় লাগলো মাত্র চার মিনিট। পদ্মিনীদের বাড়ি যে কাছাকাছি হবে সেটা সে ধারণা করেছিল ওকে এবং ওর মাকে ত্রিপুনীথুরাতে কেনাকাটা করতে দেখে। যাই হোক, অমিতাভ এবারে বিদায় চাইলো, আসছি আমি—

না বললে বুঝি বাড়িতে ঢুকবেন না?

পদ্মিনীর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ ভাবতে লাগলো, ট্রেনে ওকে দেখেছিল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মহিলা হিসেবে; অফিসে সংগঠনের জবরদস্ত বুদ্ধিদীপ্ত সেক্রেটারি আর এই মুহূর্তে সে পুরোপুরিই একজন মেয়ে। এবং এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। কিন্তু মানুষের লোভ জিনিসটা সাঙ্ঘাতিক। অল্প পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় সামনে না জানি আরও কতো রত্নভাণ্ডার লুকিয়ে আছে! অমিতাভকে এক ছেলেমানুষি খেলায় পেয়ে বসলো। পদ্মিনীদের বাড়িতে যাবার আকাঙ্ক্ষাকে সে আড়াল করে রেখে নিচু সুরে বললো, আপনার অসুবিধে হতে পারে! কি দরকার!

আবারও সেই এক কথা! পদ্মিনী একটু ফণা তুললো। সেদিন তাহলে মাকে কথা দিয়েছিলেন কেন, নিশ্চয়ই আসবো?

আমি আমার কথা রাখাটাকে পবিত্র কাজ বলেই মনে করি। কালকে যাবার আগে একবার নিশ্চয়ই আসবো। চুরি করে ধরা পড়ে যাওয়া শিশুর হাসি নিয়ে অমিতাভ অন্যদিকে মুখ লুকালো।

আমার কথায় যেতে আপত্তি, তাই না? পদ্মিনী এখন দারুণ শান্ত। কোনোরকম উচ্ছ্বাস বা আবেগ তার কথায় প্রকাশ পেল না। যেটা পেল তা হলো সূক্ষ্ম এক অভিমান।

অনসূয়া ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো গেটের কাছে পদ্মিনী এবং অমিতাভ দাঁড়িয়ে। ওরা ওখানে কি করছে? বাড়িতে ঢুকছে না কেন? প্রশ্নগুলো তাঁকে তাড়া করে একেবারে গেটের কাছে নিয়ে গেল। অনসূয়া স্নেহের সুরে ডাক দিলেন, ভেতরে আসবে না? পদ্মিনী বড়ো বড়ো চোখ করে অমিতাভর দিকে তাকালো! ছেলেটা কি করে এবারে দেখা যাক। অমিতাভ প্রথমে অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে পরে পদ্মিনীর ঘন পালকে ঘেরা চোখ দুটোর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিরুচ্চার এক অধ্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে গভীর সুরে বললো, সেই জন্যই তো এলাম!

দারুণভাবে সাজানো ড্রইংরুমে বসে ওরা গল্প করছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ভূমিকা থেকে শুরু করে কলকাতার সব ভালোর মধ্যেও টিউমারের মতো যানবাহন সমস্যা ও ট্রাফিক জ্যামের গোলকধাঁধা সহ্যের বাইরে—এ আলোচনাও বাদ গেল না। পদ্মিনী হাসতে হাসতে বললো, আমার মা বাঙালী বলে বলছি না—সত্যিই বাঙালীদের অসীম ধৈর্য এবং রসবোধ। কলকাতার উপচে পড়া ভিড় বাসে আমি বেশ কয়েকবার উঠেছি। অতো কষ্ট করে বাসের মধ্যে মানুষগুলো মাথার ঘাম ফেলতে ফেলতেও কি চমৎকার নানা ধরনের গল্প করে চলেছেন। কেউ হয়তো পুরো গল্পটা শোনেননি। সেই স্টপেজ থেকেই উঠেছেন। অথচ দারুণ একটা টিপ্পনী কেটে বাসের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিলেন। ঐ দমবন্ধ হওয়া কষ্টের মধ্যেও এমনিভাবে আনন্দ পাওয়া সত্যিই ভাবা যায় না!

ঐ সময়ে ঘরে যিনি ঢুকলেন অমিতাভর কাছে মুখটা পরিচিত মনে হলো। হ্যাঁ ভদ্রলোককে এর্নাকুলাম স্টেশনে দেখেছিল। পদ্মিনীকে আনতে গাড়ি নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন! পদ্মিনী

পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বাবা। অমিতাভর সম্পর্কেও সে দু-চার কথা তুলে ধরলো। রমন কোম্পানী থেকে রিজাইন দেওয়ার বিষয়টাও বাদ গেল না! অমিতাভ প্রণাম করতেই জগন্নাথ ঊষা সামান্য একটু হাসলেন। মেয়ের দিকে একপলক তাকিয়েই অমিতাভকে সমান হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কাজে যোগ দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছাড়লে কি ব্যাপার? ইউনিয়নের মেম্বার-টেম্বার হওনি বুঝি?

অমিতাভ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই পদ্মিনী তার বাবাকে শাসন করলো, তুমি এমনটা বলতে পারো না। ইউনিয়ন কাউকেই মেম্বার হবার জন্য চাপ দেয় না।

তা দেয় না। তবে মা, তুমি যা একখানা ইউনিয়ন আমার কোম্পানীতে তৈরি করে এসেছো আমি দম ফেলার ফুরসুত পাচ্ছি না। জগন্নাথ ঊষা মেয়ের মাথায় স্নেহ মাখানো হাতখানা বুলিয়ে বললেন, আমার ওখানে দেখেছিলাম তো —আজ সকালে যে ছেলেটি কাজে যোগ দিল বিকেলের মধ্যেই ইউনিয়নের মেম্বার হয়ে দেওয়ালে পোস্টার মারছে।

পদ্মিনী মুখ খোলার আগেই অনসুয়া স্বামী এবং মেয়ে দুজনকেই অর্ডার দিলেন, অমিতাভ আজ আমাদের বিশেষ অতিথি। ও নিশ্চয়ই এসব কচকচি শুনতে আসেনি—তোমরা অন্য গল্প করো।

ক্রমশ দিয়ে ব্যাপারটা এখানেই শেষ করা যাক, কি বলিস পদ্মিনী? জগন্নাথ ঊষা মেয়ের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে খেদের সুরে বললেন, আসলে কি জানিস মা, ইউনিয়ন নেতাদেরও একটা বিবেচনাবোধ থাকা দরকার। ওরা দাবি জানিয়েছে সর্বনিম্ন বেতন দেড় হাজার টাকা করতে হবে। আমার এই ছোট কোম্পানীতে কি সেটা সম্ভব? দেশের বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানী যা দিতে পারে না—

আবার আরম্ভ করলে তো? অনসুয়ার একটি ধমকেই জগন্নাথ শান্ত হলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাবা তাহলে আমাদের কেরালা ছেড়ে চলে

যাচ্ছো? কথার এই জোড়াতালিতে ঘরের চারজন মানুষই প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে স্বর্গীয় এক হাসিতে নিজেদেরকেই অমলিন করে তুললেন।

এখন রাত প্রায় দুটো। অমিতাভর আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। কলকাতা থেকে এখানে এসে প্রথম দিন ঘুম হয়নি বাড়ির কথা চিন্তা করে। আজ সম্ভবত কোচিনে তার শেষ দিন। এখানকার পরিচিত মানুষদের কথা ভেবে অমিতাভর দু-চোখ থেকে ঘুম সরে গেছে অনেক দূরে। জেমসদার মতো সহৃদয় মানুষ কি সব সময়ে মেলে? আর পদ্মিনী? ওর দুই ভরাট চোখে নিরুচ্চার অভিব্যক্তি যা সহজেই মনকে উদার এবং উদাস করে দেয়। বিশেষ করে আজকে ওর ব্যবহার যেন সেই মনকে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি থেকে অমিতাভ রাত পৌনে ন'টা নাগাদ উঠবার চেষ্টা করতেই পদ্মিনী প্রথমে তার চোখে চোখ রাখলো। পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের কানে মুখ রেখে কী যেন বলতেই অনসূয়া অবাক হলেন। উঠবে কী? এই রাতে না খেয়ে কেউ ফিরে যায়? ঐ একটি ধমকে অমিতাভ ঠাণ্ডা হয়ে যেতেই পদ্মিনীর চোখের তারায় জ্বললো রংমশালের আলো। তবে সে খুব চাপা। অহেতুক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পদ্মিনী কখনই নিজেকে প্রকাশ করে না। ব্যাপারটা মিটে যেতেই সে স্বাভাবিক ছন্দে মায়ের সঙ্গে হাত লাগাতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো এই দৃশ্যটা অমিতাভর দুই চোখে আটকে রয়েছে। এই ছবি থেকেই অমিতাভ চমৎকার এক নির্যাস পেয়ে ঘুম থেকে ক্রমশ পিছু হটতে লাগলো! এমন রাতে না ঘুমোলেই বা কি এসে যায়? জেগে থাকলেও যে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না সেটা এই প্রথম অনুভব করা গেল।

কাল সকালের ফার্স্ট আওয়ারে প্রথম কাজটাই হবে হোটেলের বিলটিল মিটিয়ে দেওয়া। ওসব কাজ শেষের দিকে রাখতে নেই। হ্যাঁ, টাকা পয়সা সব জেমসদাই দিয়েছেন। অমিতাভর সঙ্কোচ

দেখে জেমস গনসালভেস বড়ো মাপের একটা ধমক দিয়ে শর্তও জুড়ে দিয়েছিলেন, তোমার এতো লজ্জা পাবার কী আছে ? তুমি কী ভিক্ষে নিচ্ছো নাকি ? এটা হলো লোন। তবে হ্যাঁ—আগামী পনেরো বছরের মধ্যে এই লোনটা শোধ করতেই হবে।

পরদিন দুপুরে রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানীর কর্মচারীদের মিছিল বার হলো। গঙ্গাধরম বললো, স্যার, আজকে আপনি বিকেলের ট্রেনে চলে যাবেন কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের বিকেল ছ'টায় নেহরু স্টেডিয়ামে বিজয় উৎসব।

কিন্তু গঙ্গাধরম—অমিতাভ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মিছিলে এতো মহিলা, শিশু, এমন কী বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা পর্যন্ত রয়েছেন। এঁরাও কি কোম্পানীতে কাজ করেন ?

আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, ওঁরা কাজ করেন না। গঙ্গাধরম সৌজন্য দেখিয়ে অল্প হেসে বললো, ওঁদের ছেলে, স্বামী, কারুর বা বাবা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চাকরি করেন। অতএব যতোটা সম্ভব সেই বাড়ির সকলেই বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে আনন্দ পেতে চায়—এটা এখানকার একটা রীতিও বলতে পারেন।

অমিতাভর ট্রেন বিকেল পাঁচটা দশে। কিন্তু মিছিলের জৌলুস দেখে সে চারটের আগেই বেরিয়ে পড়লো। পথে যদি কোথাও আটকে যায়—সুতরাং হাতে সময় নিয়ে বের হওয়াই ভালো। গঙ্গাধরম পায়ে পায়ে অমিতাভর সঙ্গে লেগে রয়েছে। সে নিজে ট্যাক্সি ডেকে এনে জিনিসগুলো তুলে দিল। অমিতাভ কোনো কিছু ফেলে যাচ্ছে কী না সে চিন্তা তারই যেন বেশি। অতএব দৌড়ঝাঁপ সবই গঙ্গাধরমের।

আমি তাহলে আসি গঙ্গাধরম ?

আসুন স্যার। ছলছল চোখে ছেলেটা তাকিয়েই রয়েছে।

তোমার মাকে বোলো পরে একদিন এসে তোমাদের বাড়িতে ঠিক থাকবো। আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম, সেটা ভুলিনি। আর তখন অনেক তৃপ্তি নিয়ে তাঁর হাতের তৈরি মহীশুর মসলা ধোসা খাবো।

আপনার কথা মা'কে নিশ্চয়ই বলবো স্যার।

এর্নাকুলাম স্টেশনের উদ্দেশে অমিতাভ রওনা হয়ে যাবার পরেও আচ্ছন্নের মতো ওখানে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গাধরম। কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সেই হিসেব নিজেও রাখেনি। হঠাৎ পদ্মিনীর গলা শুনতে পেল, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেছেন ?

হ্যাঁ।

কখন গেলেন ?

তা তো জানি না—শুধু জানি স্যার চলে গেছেন।

মুহূর্ত আর অপেক্ষা করলো না পদ্মিনী। আম্বালামেডু থেকে যে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল ঐ ট্যাক্সিতেই আবার রওনা দিল। বেশ কিছুটা ভালোভাবে এগিয়েও ছিল কিন্তু এনমপুরমের মুখটাতে এসে সবকিছু অচল হয়ে গেল। বাস ট্যাক্সি, ভ্যান, ট্রাক, অটো স্কুটার যাবতীয় গাড়ির ড্রাইভাররা স্টার্ট বন্ধ করে রাখলো। তিন রাস্তার জংশনে তখন মিছিল পেঁছেছে। স্বতস্ফূর্তভাবে তারা তখন ঘনঘন নাড়া দিচ্ছে, এই বিরাট জয়ের উল্লাসে। এটা কোনো দেখানো ব্যাপার নয়। ভেতরের টান, সুতরাং এ জিনিস চলবেই। কিন্তু পদ্মিনী স্টেশনে পেঁছাবে কী করে ? সেখানে দেখা করে ফের ওকে সময় মতো ফিরতে হবে মিটিংয়ে। সেটাও জরুরি। তবে স্টেশনে সময় মতো উপস্থিত হতে না পারলে অমিতাভ কী একবারও অন্তত তার ভদ্রতা বা সৌজন্যের ব্যাপারেও একটু সন্দেহ প্রকাশ করবে না ? তাছাড়া বিদায় মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়ানোও এক ধরনের শাস্তি। অস্বীকার করে কী লাভ, সেই শাস্তি পদ্মিনীও পেতে চায়। কিন্তু মানুষে মানুষে কোচিন আজ মুখরিত। কল্লোলিনী কোচিনের মেজাজই এই মুহূর্তে অন্যরকম। এখন শুধু মানুষই এগিয়ে যাবে—যানবাহন সব পেছনে পড়ে থাক।

অস্থির মন নিয়ে পদ্মিনী ট্যাক্সির মধ্যে বসে শুধু ঘামতে লাগলো। এগিয়ে যাবার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। কিন্তু আশ্চর্য ঠাণ্ডা তার মেজাজ। মিছিলের মানুষগুলোর ওপর অসীম মমতায় চোখ রেখে সে নিজেও ওদের জয়কে অনুভব করলো। সেই অনুভূতিটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তেই পদ্মিনী আবিষ্কার

করলো অমিতাভর ব্যাপারটাও তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। গতকাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পদ্মিনী ওকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসে খুব আস্তে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের যেমন দুর্গাপুজো, আমাদেরও তেমনি ওনম উৎসব। ঐ সময়ে একবার আসতে পারবেন ?

কোনো উত্তর না দিয়ে অমিতাভ শুধু নীরবে পদ্মিনীকে দেখছিল। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট সুরে জানতে চাইলো, ওনম উৎসব কবে ?

আসছে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু। শেষ হবে রবিবার। পদ্মিনী তার ঘন পালকে ঘেরা মায়াময় চোখ দুটো দিয়ে যেন অমিতাভকে অনেক কাছে টেনে নিলো, অন্তত দুদিনের জন্যেও যদি আসতে—

আমি তো এখানে থাকতেই চেয়েছিলাম। সেটা যখন হলো না তখন নতুন কাজে যোগ দিয়ে আবার এখানে আসার জন্যেই এতো তাড়াতাড়ি ছুটির কথা বলা কী সম্ভব ? আপনি আমার ইচ্ছেটাই শুধু বাড়িয়ে দিলেন।

তবুও একবার চেষ্টা করে দেখুন—

যে চেষ্টায় ফল নেই আমি তেমনটা করি না। অমিতাভ সামান্য একটু হেসে বললো, রমন কোম্পানীতে থাকবার জন্য তো তবে আপনার কাছেই চেষ্টা করতে পারতাম। আমি জানি ঐ ধরনের অন্যায় আপনি কোনোদিনও করতে পারবেন না। যাই হোক, ওনম উৎসবে আসতে না পারলেও পরে নিশ্চয়ই আসবো।

পদ্মিনী যখন স্টেশনে পৌঁছালো ঘড়িতে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাদ্রাজ এক্সপ্রেস চলে গেছে। আত্মীয় স্বজনদের যারা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল তারাও ফেরার মুখে। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে পদ্মিনী এক দুরন্ত অস্থিরতা নিয়ে প্রায় ছুটেই প্ল্যাটফর্মে যখন ঢুকলো চারদিক তখন ফাঁকা। দু একজন কুলি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অন্য দিকে সরে গেল। বুকস্টলের ছেলেটা একটা ঝাড়ন দিয়ে ধুলোর হাত থেকে বই এবং

পত্রিকাগুলোকে বাঁচাতে ব্যস্ত। চার চাকার খাবারের গাড়ির লোকটা পয়সা গুনছে কতো টাকার বিক্রিবাটা হলো সেটা বুঝে নিতে। এছাড়া এর্নাকুলাম স্টেশনের প্ল্যাটফরমগুলো যেন এক রুক্ষ শূন্য প্রান্তরের ওপর কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অমিতাভর কথাটা তার দুই কানে এখন বেজে চলেছে, 'আমি জানি ঐ ধরনের অন্যায় আপনি কোনোদিনও করতে পারবেন না।'

বিষন্নতা বিহ্বলতার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে পদ্মিনী তখন একা। ক্লান্ত এবং অসহায় দৃষ্টি নিয়ে সে সোজা তাকিয়ে রইলো। প্ল্যাটফরমগুলোর ঢালু হয়ে যাওয়া শেষ প্রান্তরেরও বেশ কিছুটা দূরে তিন-চারটে শকুন কী যেন একটা খুবলে খুবলে খাচ্ছে। শূন্য স্টেশন নয়—চারপাশে চোখ বুলিয়ে পদ্মিনী যেন নিজের নিঃস্ব ভেতরটাকেই দেখতে পেল।